আকাশের চাবি

কণা বসু মিশ্র

বর্ণালী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
কান্তি রঞ্জন ঘোষ
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রকাশ কাল :
মহালয়া—১৩৭০

প্রচ্ছদ :
স্বপন মণ্ডল

মুদ্রক :
সাধন চক্রবর্ত্তী
নবীন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৩, ডাঃ কার্ত্তিক বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

বিশ্বজিৎ মিশ্রকে

এঘরে আমি একা বসে আছি। বসে বসে আকাশের তারা গুণছি। সন্ধ্যাতারা, সপ্তর্ষিমণ্ডল এইসব। আমায় তারা গুণতে শিখেয়েছিলেন আমার মা। ছাদের ওপরে মাদুর পেতে বসে সন্ধ্যেবেলা আমার মা আমায় সপ্তর্ষিমণ্ডল চিনিয়েছিলেন। তখন মা আমার খুব বন্ধু ছিলেন। আমার গলা জড়িয়ে ধরে মা বলতেন, 'রূপ্‌সি, বড় হ'লে তুই আমায় মনে রাখবি তো?" "কেন মনে রাখব না মা?" মা অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ত। বলতেন, "কি জানি, আমার খুব ভয় করে। মনে হয়, তুই বোধহয় হারিয়ে যাবি।" "আমি কোথাও হারিয়ে যাব না মা।" মায়ের বুকের মধ্যে আমি মুখটা গুঁজে দিতুম। তখন কান্নায় মার শরীরটা ফুলে ফুলে উঠত। মায়ের কান্না দেখে আমারও কান্না পেত। আমি আর মা কত রাত পর্যন্ত শুয়ে থাকতুম ছাদে। জোছ্‌নায় ধব্‌ধব্‌ করত আমার মায়ের শ্যামলা গায়ের রঙ। তখন মাকে আমার স্বপ্নে দেখা দুয়োরাণীর মত মনে হ'ত। আমার মায়ের কোঁকড়ানো চুলের গোছা ভেঙে পড়ত পিঠে। টানা চোখের নীচের বড় বড় পাতাগুলো ভিজে উঠত, তখন কি যে সুন্দর লাগত আমার মাকে।

আমার সেই মা হারিয়ে গেল কোথায়? আমি তো হারাইনি। আমি জানি, অমন সুন্দর করে মা আর এখন কাঁদতে পারে না। ছাদে মাদুর পেতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে মা কি বলতে পারবেন আবার "রূপসি, তোর মত এতো আপন আমার আর কেউ

নেই রে।" মাঝে মাঝে মনে হয়, আমিও বোধহয় বদলে গেছি। আমি চেষ্টা করেও মার কাছে আর ঘনিষ্ঠ হতে পারব না। মার কাছে নিজেকে মেলে দিতে চাই। কিন্তু পারি না। মা সামনে এলে আমি বোবা হয়ে যাই। আমার মুখের কথা হারিয়ে যায়। তখন আমার বুকের মধ্যে যন্ত্রণার বাজনা বাজে। বিসর্জনের বাজনা বাজে। মায়ের সামনে থেকে পালিয়ে যাই। শ্রীময়ী, রূপেণ, অতনু ওদের ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে আমি বুকের বাজনাটা বন্ধ করি।

আজ দারুণ জোছনা উঠেছে। জোছনায় সাদা হয়ে আছে ওই নিমগাছটা। এখনো রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে। লোড-শেডিং হয় নি। সারাদিন লোড-শেডিং ছিল। বিশ্রী গুমোট গরমে পোচে সেদ্ধ হয়েছি। ছ'টা নাগাদ পাওয়ার এসেছে। টিউশনি থেকে ফিরে আমি গাটা ধুয়ে সবে এই চেয়ারটা টেনে বসেছি জানলার ধারে, অমনি পাওয়ার এলো। সুইচ টেপাই ছিল। বন্ধ পাখাটা বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল। আমিও আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। এ সময় আমার খুব একা লাগে। রোজ নয়। যেদিন বাড়ি থাকি। কেউ আসে না আমায় সঙ্গ দিতে। সেদিন নির্জনে বসে আমি কাঁদি। ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করি। অতীত বড় মধুর। সে অতীত যদি দুঃখের হয় তবুও। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আমি চুপচাপ বসে আছি। ওপাশের ঘরে মা আর রাহুলবাবা। ওদের সামনে টি-ভি চলছে। মা রাহুলবাবার পিঠে নাইসিল পাউডার মাখিয়ে দিচ্ছে। টুপ্‌সিও ও-ঘরে। রাহুলবাবার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আহ্লাদী করছে। মায়ের হাসির শব্দ আসছে। রাহুলবাবারও। মায়ের হাসি, রাহুলবাবার হাসি, দ্বৈত সুরের মত আমার কানে ছিটকে আসছে। ওরা অমন করে হাসছে কেন? বাড়াবাড়ি। হাসির উৎস বোধহয় টুপ্‌সি। ন্যাকামি। ওর কথা নিয়ে অত হাসবার কি আছে? আট বছরের ধিঙ্গী। এখনো সেই আধো আধো কথা। রাহুলবাবার সামনে মা যেন কেমন ছেলেমানুষী করেন। তখন মায়ের বয়েস আর টুপ্‌সির বয়েস

মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আমিও তো ছোট ছিলুম একদিন। আমি তো বাবার সঙ্গে অমনি করি নি? যতদূর মনে পড়ে, মাও। মা ছিল খুব সংযত। সেই সংযমী মাকে আমার মনে পড়ে। আর বাবা? থাক, বাবার কথা আর ভাবতে চাইনে।

"কে?" ধপ্ করে আলোটা নিভে গেল। লোড-শেডিং। আর পারা যায় না। "তুমি অতনু তো?" "হ্যাঁ।" আমি ঠোঁট ভেঙে হাসি। বলি, "সে আমি দরজার কড়া নাড়ার শব্দেই ধরে ফেলেছি। দাঁড়াও আলোটা জ্বালি। আমার মোম্‌টা জ্বলে জ্বলে ফুরিয়ে গেছে কাল শেষ রাত্তিরে। দেখি, আর একটা পাই কি না।" "কেন, আলো ছাড়া কি আমার প্রবেশ নিষেধ?" "না, নিষেধ নয়। আলো জ্বেলে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানোই ভদ্রতা।" "অতিথি! আমি কি তোমার আজও অতিথি?" "তা নয় তো কি?" "হেঁয়ালি রাখো। তুমি দরজা খোলো। এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে।" "এই না। কক্‌খনো নয়। প্লীজ দাঁড়াও, এক মিনিট।" "যাহ্ বাব্বা। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে........। দেখি তো আমার পকেটেই বোধহয় একটা টর্চ আছে। পেন্সিল টর্চ।" "বাহ্, ফাইন। বললে তো।" "খেয়াল ছিল না।" "তোমার সঙ্গে টর্চ থাকে? দীপঙ্কর রূপেনদের সঙ্গে টর্চফর্চ থাকে না।"

খোলা জানালা দিয়ে টর্চের আলো ফেলে অতনু। একেবারে আমার মুখের ওপর। আমি ঠোঁট ভেঙে হাসি। টর্চের আলোটা গোল হয়ে ঘোরে আমার পা থেকে মাথায়। মাথা থেকে পায়ে। তারপর আমার চোখের ওপর স্থির হয়ে যায়। আমি তাকাতে পারি না। আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। "এই কি হচ্ছে?" আমার ছোট্ট ধমকে অতনু হাসে। আমি বলি, "আবার?" অতনু বলে, "এই আলোর বৃত্তটাকে ধরতে পারবে?" "না।" অতনু কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। ও কি যেন ভাবে। আলমারীর তাকে আমি একটা মোমবাতি খুঁজে পাই। অতনুকে বলি, "এই, দেশলাই ছোঁড়ো।"

ও দেশলাইটা ছুঁড়ে দেয় জানালা দিয়ে। আমি ধরে ফেলি। দু হাতের মুঠোয় ধরে ফেলে আমি বিজয়িনীর মত হাসি। যেমন করে ছোটবেলায় ক্যাচ ধরতাম।

আলো জ্বেলে দরজা খুলি। ভেতরে পা দিতে দিতে অতনু বলে, "তুমি বড্ড ফরম্যাল।" "কেন? আলো জ্বালালুম বলে?" ও কোন জবাব দেয় না।

অতনু ঘরে ঢোকে মৃদু সুবাস ছড়িয়ে। "এই, কি মেখেছ তুমি?" ওর বুকের কাছে এগিয়ে যাই আমি। বড় চেনা গন্ধ। "রূপেনও আগে এটা মাখত। এখন পাল্টে ফেলেছে।" অতনু বলে, "রাবিশ! ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তুমি রূপেনের নাম করলে? ওটা একটা অপয়া। আজ সন্ধ্যেটাই আমার মাটি হবে।" "ও তোমার কাছে অপয়া হতে পারে অতনু। আমার কাছে তো নয়?" অল্প হেসে আমি তাকাই। অতনু মুখ ভার করে। ও দু কনুইতে দু হাত রেখে আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি বেতের মোড়াটা এগিয়ে দিই। "বোসো অতনু।" অতনু বসে না। ও অভিমানী গলায় বলে, "তুমি রূপেনের সঙ্গে আমায় একই ক্যাটেগরীতে ফেলতে চাও নাকি?" "আহা, নয়ত কি?" আমি বলি। অতনু তখন তেতে ওঠে। ও পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে ঠোঁটে একটা সিগারেট রাখে। ফস্ করে একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে ধরায় সিগারেট। অতনু একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তেরছা চোখে দেখে আমায়। অতনু বলে, "যেমন রূপেন বড় বড় চুল রাখে, আমি রাখি না। যেমন রূপেন দাড়ি কামায় না, আমি দাঁড়ি কামাই। যত্ত সব।" অতনুর গলা ব্যঙ্গে ফেটে পড়ে। আমি হেসে বাকীটা যোগ করি, "যেমন রূপেন আমায় চায়, তুমি আমায় চাও।" "না তো। মোটেই না। আমি তোমায় চাই না।" "আহা, ওটা তোমার রাগের কথা হল।" আমি মুচকি হাসি। অতনু তবু মাথা নাড়ে। "না না, আমি তো কোন

উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার কাছে আসি না।" অতনু মোড়াটা টেনে বসে। আমিও বসি আর একটা মোড়ায়।

"তবে আমার কাছে আসো কেন?" "আসতে ভাল লাগে তাই আর কি।" হাত নেড়ে অতনু বলে। এটা ওর একটা মুদ্রাদোষ। কথা বলতে গেলেই হাত নাড়া। আমি হাসি। বলি, "তবে? ভাল লাগাটা কি উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না?" অতনুর উত্তেজনা কমে না। ও বলে, "খবরদার বলছি আমায় রূপেন-টুপেনদের দলে ফেলবে না।"

কাদের বাড়িতে যেন রান্নাঘরে কয়লার উনুনে আঁচ দিয়েছে। এ-পাড়ায় গ্যাসের ব্যবহার কম। কাঁচা কয়লার ধোঁয়া আসে পাকিয়ে পাকিয়ে। ঠাসাঠাসি বাড়ি। আমার চোখ জ্বালা করে। ঘরে গিয়ে বসারও তো উপায় নেই। যা গরম! আমি অতনুর দিকে তাকাই। বলি, "এতো রেগে যাবার কি আছে? তোমার মানসিক বয়েস কত বলত? পাঁচ?" আমি হেসে উঠি। অতনু হাসে না।

আমি জানি না কখন নিঃশব্দে আমার মা এসে দাঁড়ান। ভারী পর্দার ওপাশে উঁকি মারে রবারের চপ্পল পরা আমার মায়ের এক-জোড়া পা। হাসি মিলিয়ে যায়। আমার মুখে কে যেন ক্লিপ এঁটে দেয়। মা অতনুকে খুঁটিয়ে দেখেন, "তুমি এ সময়?" অতনু অপ্রস্তুত হয়। "এই এলাম!" "সে তো দেখতেই পাচ্ছি।" মায়ের এই গলার স্বরটা আমার ঠিক ভাল লাগে না। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে মা বলেন, "এবারে রূপ্‌সির ফাইন্যাল ইয়ার। পড়াশুনোর সময়টায় এভাবে আসা আমি খুব অপছন্দ করি।"

অতনু কোন জবাব দেয় না। আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। আমি জানি, আমার মা সেকেলে মা নন। সন্ধ্যেবেলা তাঁর মেয়ে পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, এটা নতুন কিছু নয়। রূপেন, দীপঙ্করেরা এলে উনি তো রীতিমত খুশী হন। এমন কি নিজেও ভিড়ে যান ওদের দলে।" আমার জেদ চেপে যায়। সে জেদ মাকে অপদস্থ করার। মার দিকে তাকিয়ে আমি উদ্ধত ভঙ্গীতে বলি, "ওকে আমি

আসতে বলেছিলাম।" অপরাধীভাবে অতনু দেখে আমায়। ও তো জানে, কথাটা কত মিথ্যে।

মায়ের মুখটা লাল হয়ে ওঠে। ভুরু বেঁকিয়ে উনি তাকান। বুঝতে পারি, আমার স্পর্ধা ওঁকে অবাক করে। "এ সময় ওকে আসতে বলে তুমি ভাল কর নি।" মা আর দাঁড়ান না।

ভীতু চোখে অতনু তাকায় আমার দিকে। আমার ভাল লাগে না ওর এই দৃষ্টি। ও না পুরুষমানুষ! আমার তখন রূপেনের কথা মনে হয়। এ যদি অতনু না হয়ে রূপেন হত, তাহলে ও ঠিক মায়ের সঙ্গে এখন তর্ক করতে বসত। আর তর্কে মা নির্ঘাত হেরে যেতেন। মা কিন্তু হারতে ভালবাসেন। হারিয়ে দেবার কায়দাটা যার জানা আছে, সেই মাকে বশ করতে পারে। যেমন, রাহুলবাবা। আমি জানি, মা রাহুলবাবাকে ভয় করেন। কিন্তু, আমার বাবা? আমার বাবাকেও তো মা ভয়ই করতেন। তবে তাঁকে ভালবাসতে পারেন নি কেন?

অতনুর ওপরে রাগ করতে চেয়েছিলুম। পারলুম না। ওর ওই নিরীহ গোবেচারা মুখ দেখে আমার খুব করুণা হ'ল। অতনু বলে, "আমি আজ চলেই যাই।" ওর পক্ষে একথা বলাই স্বাভাবিক। যে মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ নেই, তাকে আমরা মানুষ বলি না। ঘৃণা করি। কিন্তু, অতনু চলে গেলে মাকে তো অপমান করা হয় না? আমি ওর পাঞ্জাবীর কোণ চেপে ধরি। "না, যেও না, প্লীজ।" অতনু দুর্বল হয়ে পড়ে। ওর আর সাহস হয় না আমার অনুরোধ উপেক্ষা করার।

পোড়া কয়লার ধোঁয়া সরে গেছে। সামনের নিমগাছটায় হু হু করে হাওয়া বইতে থাকে। ছেঁড়া মেঘ উড়ে এসে ঢেকে ফেলে চাঁদটাকে। আবার মেঘ সরে যায়।

অতনু ওর পাঞ্জাবীর পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের, ঘাড়ের ঘাম মোছে। "সারাদিন যা ধকল গেছে না।" অতনু বলে। আমি মুখের দিকে তাকাই। "তুমি খুব কাজের লোক হয়ে উঠছ

দেখছি।" "না, তেমন কোন কাজ নয়। ওই নাটকের রিহার্সালের ব্যাপারে।" "তোমাদের সেই পাড়ার নাটক?" আমি হাসি। "পারোও বাবা। এখনো তোমাদের পাড়া পাড়া ভাব গেল না।" অতনু চাপা নিশ্বাস ফেলে। বলে, "ওটাকে নিয়েই তো বেঁচে আছি। রকবাজি, রাজনীতি ওসব দলে তো নেই। পাড়ার কিছু বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে মাঝে-মধ্যে নাটক করি। তা যা লোড-শেডিংয়ের বহর চলছে, তাতে করে আমাদের নাটক শেষ পর্যন্ত স্টেজে নামানো যাবে কি না ভাবছি।" "কেন, হ্যাচাক জ্বেলে কর?" "হ্যাচাক?" অতনু হেসে ফেলে। "বলেছ বেশ। ভালো আলোকসজ্জা হবে? যা তা বলবে অডিয়েন্স।" "মোটেই বলবে না। একটা নতুন কিছু হবে।" আমি জোর করে হাসি। অতনু হাসতে পারে না। আমি জানি, এতটা হাসির মত কথা আমি বলিনি। কয়েক মিনিট আগে যে অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটে গেল, আমি সেটা ভুলতে চাই। অতনুকেও ভুলিয়ে দিতে চাই এই অপমানবোধ।

কিন্তু আমাদের কথা আর এগোয় না।

পায়ের ওপরে পা নাচিয়ে অতনু সুর ভাঁজতে থাকে। আমি চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজি। অতনু কেন গাইছে? ও চুপ করে থাকলেই তো পারত। এই মুহূর্তে ওর গলায় গান আমার বোকা বোকাই লাগে। তবু আমি প্রতিবাদ করি না। আমার মায়ের অপমানের প্রতিশোধ হিসেবে অতনুর গান আমার এখন হাতিয়ার বলে মনে হয়। আমি বলি, "এই অতনু, চেঁচিয়ে গাও।" অতনু ইতস্ততঃ করে। আমি জেদ ধরি। বলি, "হ্যাঁ, গাইতেই হবে।" অতনু থেমে যায়।

আমি পাশের ঘরে মা আর রাহুলবাবার কথা কাটাকাটি শুনতে পাই। রাহুলবাবা বলছেন, "এটা কোন পাবলিক প্লেস নয়, যে যার খুশি সে এসে ঢুকে পড়বে।" মা বলছেন, "আমার মেয়ের বন্ধু আসবে না?" বিকৃত গলায় রাহুলবাবা বললেন, "বন্ধু? না প্রেমিক?"

"কি যা তা বলছ ?" "আমি ঠিকই বলছি।" "না, তুমি ঠিক বলছ না।" "তোমার আস্কারা পেয়েই এরা ঢোকে।"

মা যেন কি বলতে চেষ্টা করেন। রাহুলবাবা বাধা দেন। "হয়েছে, হয়েছে, থাম।"

আমি বুঝতে পারি, মায়ের অসহায় অবস্থা। কিন্তু মায়ের ওপরে আমার মায়া হয় না কেন? অতনুও বোধহয় শোনে কথাগুলো। আমি ভাবি, এবারে বোধহয় ও উঠে দাঁড়াবে। চলে যাবে অতনু। কিন্তু ও যায় না। রাহুলবাবার গলা শুনি আবার। "বলে আসব নাকি তোমার মেয়েকে কিছু ?" "না না।" মার গলায় অনুনয়।

বেপরোয়া হয়ে ওঠে অতনু। ও জোরে গান গায়। তখন অতনুকে আমার ভাল লাগে না। অথচ এই আমিই তো কিছুক্ষণ আগে বেপরোয়া অতনুকে খুঁজেছি। অতনুকে আমার ভাল লাগে না। তবু অতনুর কাছে আমি যাই। অতনু আমার কাছে আসে। আমি সময় কাটানোর অবলম্বন খুঁজি। রূপেন, দীপঙ্কর, অতনু এদের সবাইকে আমি চাই। কাউকে বাদ দিয়ে কেউ আমার কাছে সম্পূর্ণ নয়। আমি বৈচিত্র্য খুঁজি। অতনুর মধ্যে যা পাই না, তা রূপেনের মধ্যে পাই। রূপেনের মধ্যে যা পাই না, তা দীপঙ্করের মধ্যে পাই। আমি সবার মধ্যে হারিয়ে গিয়ে কি যেন খুঁজি। খুঁজে বেড়াই।

অতনুর গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী। পরনে পাজামা। নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো। চুলগুলোও ছোট করে ছাঁটা। চোখে পুরু লেন্সের কালো ফ্রেমের চশমা। ওর সাজগোজে কোন চালিয়াতি নেই। ওর এই চটকহীন বেশভুষো আমার ভাল লাগে। কিন্তু ওর আচার-আচরণের মধ্যে কোথায় যেন একটা ত্রুটি। ওর মাত্রাজ্ঞানটা বোধহয় কম। কোথায় থামতে হয় অতনু জানে না।

ও দরাজ গলায় গাইতে থাকে। আমার বুকের মধ্যে সেই ছোট-বেলার মা, যিনি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলতেন, "রূপ্‌সি, তুই আমায় ভালবাসবি ?" আমি সেই মায়ের কান্না শুনতে পাই। আমি

চীৎকার করে অতনুকে বলতে চাই, "অতনু, তুমি চলে যাও।" কথা বেরোয় না। তখন আমি ফের বলি, "অতনু তুমি চলে যাও।" আমি এত জোরে বলি যে, নিজের গলার স্বরে নিজেই চমকে উঠি। অতনু অবাক হয়। বলে, "কেন?" "ভাল লাগছে না। চলে যাও, চলে যাও।"

অবাক হয়ে অতনু আমায় দেখে। আমি বলি, "আর কিভাবে বললে তুমি যাবে?" অতনু কোন কথা বলে না। মাথা নীচু করে বসে থাকে। তখন ওকে আমার একটা জোঁকের মত মনে হয়। রাগে ঘেন্নায় আমি উঠে যাই। দেড়তলায় পায়রার খুপরির মত আমার শোবার ঘরটাতে গিয়ে আমি শুয়ে পড়ি।

আলো নেই, পাখা নেই। চাপা ভ্যাপসা গরম। তক্তপোষের ওপর শুয়ে আমি ঘামতে থাকি। অন্ধকারের মধ্যে এক ধরনের ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

অতনু আরো কতক্ষণ বসে থাকে জানি না। বুড়ী কাজের লোকটি আমায় খেতে ডাকে। তখন রাত দশটা বেজে গেছে। আমি উঠি। বারান্দায় গিয়ে অতনুকে দেখতে পাই না।

আমি একা একা খাই। ওদের খাওয়া হয়ে গেছে। আমার জন্য কেউ বসে নেই। টুপ্‌সি ঘরে ঘুমোচ্ছে। রাহুলবাবা আর মা রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছেন। রাতের খাবার খেয়ে রাস্তায় পায়চারী করা ওঁদের অভ্যাস। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পাই, আমার মা আর রাহুলবাবা ঘন হয়ে হাঁটছেন। ওঁরা কি নিয়ে হাসাহাসি করছেন বুঝতে পারি না।

খানিক আগে অতনুর আসা নিয়েই ওঁদের মধ্যে অশান্তি হয়েছিল। সেই অশান্তির ঝড় থেমে গেছে। ওঁদের ঝগড়া হয়। কোন ঝগড়াই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। রাহুলবাবার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেন মা।

আমার বুকের মধ্যেটা খাঁ খাঁ করে। সেখানে মরুভূমির ধূসরতা।

কেউ আমায় বোঝে না। আমি কাউকে আমায় বোঝাতে চাই না। মা আর রাহুলবাবার সংসারে নিজেকে খুব বেমানান লাগে। আর কত দিন এখানে পড়ে থাকতে হবে? মায়ের ওপরে অন্ধ আক্রোশে আমি ফুঁসি। কি দরকার ছিল আমায় পৃথিবীর আলো দেখানোর?

এই যে আমি রাহুলবাবাকে নিজের বাবা বলে ভাবতে পারি না, টুপ্সিকে নিজের বোন বলে ভেবে কাছে টেনে নিতে পারি না, এজন্যে আমার মায়ের খুব দুঃখ। মা আর রাহুলবাবা অনেক চেষ্টা করেছেন আমি যাতে ওঁদের সহজভাবে নিতে পারি। কিন্তু রাহুলবাবাকে আমি কিছুতেই বাবা বলতে পারি না। সেই ছোটবেলা থেকেই আমি ওঁকে রাহুলবাবা বলছি। টুপ্সি তো আমার পর নয়। আমাদের দুজনের বাবা আলাদা হলেও, মা তো একই। কিন্তু তবু টুপ্সি যখন সেন পদবি লেখে আর আমার যখন চ্যাটার্জী লিখতে হয়, তখন মনটা যেন কোথায় দমে যায়। আমার ভেতর থেকে কে যেন আমায় বলায়, "ও তোর আপন বোন নয়।" আমি কি নীচ? কিন্তু চেষ্টা করেও যে আমি উদার হতে পারি না। আমার হিংসে হয়, রাগ হয় টুপ্সির ওপরে। তখন ও আমার কাছে আবদার করতে এলে আমি ওকে মারি। আমি নিষ্ঠুর হয়ে উঠি। আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। আমার নিজের বাবার কথা মনে পড়ে যায়। আমি, মা আর বাবা মিলে তিনজনে যখন ছিলুম, তখন আমাদের একটা বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে আমরা তিনজন। হ্যাঁ হ্যাঁ একটা তাসের বাড়ি। সেই তাসের ঘর ভেঙে গেল ঝড়ে। আর সেটা জোড়া লাগল না। ঘর বদল করে মা ঘর পেল। কিন্তু আমি কি পেলাম? নিজের ঘর ছেড়ে পরের ঘরে অতিথির মত আমায় থাকতে হল। মার ঘর আমার ঘর হল না।

॥ সোহিনী ॥

আমি বুঝতে পারছি, রূপ্‌সি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমার বুক ফেটে যায়। আমি যত রূপ্‌সির দিকে হাত বাড়াই, ও তত দূরের হয়ে যায়। রাহুলের কাছে ও আমায় বার বার ছোট করে। ও এত অবুঝ কেন? রাহুল ওকে নিজের মেয়ের মত করে আপন করে নিয়েছিল। ওকে ভাল ইস্কুলে, ভাল কলেজে পড়াল রাহুল। তবু রাহুল ওর চোখে বিষ হয়ে রইল। কোন কৃতজ্ঞতাবোধও নেই মেয়েটার। ওর নিজের বাবা তো কোনদিন ফিরেও তাকাল না। তবু ও পুরণো কথা তুলে আমায় খোঁটা দেবে। আমি কেন চলে এসেছি ওর বাবাকে ছেড়ে? আমার ওপরে ওর মনভরা বিদ্রোহ। আমার ওপরে ওর আক্রোশ। বেইমান! ও ভুলে গেল মা ওর জন্য কি করেছিল? কেন চলে এসেছিল? সেদিন না হয় ও ছোট ছিল। বোঝেনি কিছুই। কিন্তু আজ? আজ তো ও বড় হয়েছে। এ বাড়ি যদি ওর অসহ্য হয়ে ওঠে, তবে যাক না ও ওর নিজের বাবার কাছে। তাও তো যাবে না। শুধু আমায় পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারবে। বছর কুড়ি বয়েস হল। ওর একটা নিজস্ব সংসার হলে হয়ত আমি ওর হাত থেকে রেহাই পেতুম। রূপ্‌সির কাছে এ বাড়ি নরককুণ্ড। ও আমাদের কাউকে সহ্য করতে পারে না। তাই তো ওকে বলি, মনের মত কাউকে বেছে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়তে। না না, রূপসিকে আমি তাড়িয়ে দিতে চাই না। ওর বিয়েতে আমি সানাই বসাবো। আলোর রোশনাই জ্বলবে। আমার মেয়েকে আমি রাণীর মত সাজিয়ে তার স্বামীর ঘরে পাঠাব। আমি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, "ও যেন সুখী হয়। আমার মত ওর যেন ঘর বদল না হয়।" আমি সেপাইয়ের মত কড়া চোখ রাখি, রূপ্‌সির মেলামেশা মহলে। ও কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে। এই যে

অতনু আসে, ওর সঙ্গে মেলামেশা করে, এটা আমার মোটেও ভাল লাগে না। ওকে দেখলে মনে হয় ওর কোন দায়িত্ববোধ নেই। রূপসি দুঃখ পাবে ওকে এড়িয়ে না চললে। এ কথা আমার মেয়েকে বোঝাতে চাইলেও বুঝবে না। এটা তো অবুঝ হবারই বয়েস। তাই ভয় হয়, আমার জীবনের পুনরাবৃত্তি ওর মধ্যে না ঘটে।

সেই মেয়েটিকে যে আজও ভুলতে পারি নি। যাকে নিজের সংসার ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। শীতের রাতে কল্যাণ যখন আমায় তাড়িয়ে দিল, তখনো কলকাতা শহরটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। ছ' বছরের মেয়েকে নিয়ে আমি পথে নামলুম। মাথার ওপরে খোলা আকাশ আর পায়ের তলায় মাটি ছাড়া আমার কিছুই ছিল না। মা নেই, বাবা নেই, দাদারা আছে। আমার খুব লজ্জা করছিল দাদার বাড়ির দরজার কড়া নাড়তে। এত রাত। আমি কি করে গিয়ে বলব আমার স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে? কথাটা খুব বিশ্বাস-যোগ্যও হবে না। বউদিরা ভাববে, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারিনি। মেয়েদেরপক্ষে এর চেয়েলজ্জার বিষয় আর কিছু নেই। ভালবেসে হোক, ছল-চাতুরি দিয়ে হোক, স্বামীকে বশ করার কায়দা যে মেয়ে না জানে, তাকে এখনো আমাদের সমাজ দুয়ো দেয়। আন্ত-র্জাতিক নারীবর্ষ নিয়ে আমরা যতই বড়াই করি না কেন অনেক মেয়েই এখন পুরুষের পায়ের তলায়। মেয়েরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে লোকে তাদের চরিত্রহীনা বলে। স্বামীর অত্যাচারে সে যে টিকতে পারেনি, সে কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

পাড়ার চেনা রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলুম, যদি এখন কোন বাড়ির দরজা খুলে যায়। আর আমায় দেখে অবাক হয়ে সবাই প্রশ্ন করেন, "আপনি? এ সময় কোথায় চললেন?"

ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে নিয়ে বেরিয়েছিলুম। মেয়ের ঘুম ভেঙে গেল, অভ্যস্ত বিছানাটা না পেয়ে। আমার কাঁধে মাথা রেখে হঠাৎ কেঁদে উঠল। মুখ চেপে ধরে আমি ওর কান্না থামাতে চাই, ওর গলা

তত জোর হয়। চোট পায়ে হেঁটে আমি এগিয়ে যাই বাসস্টপের দিকে। রাত বারোটার লাস্ট বাসটা এসে দাঁড়ায়। পাঁচ নম্বর ডবলডেকার। যাবে গড়িয়া। ভিড়-টিড় নেই। বাসটা ফাঁকাই। কনডাকটর হাঁক পাড়ে, "গড়িয়া গড়িয়া গড়িয়া।" কি মনে করে জানি না, আমি উঠে পড়ি। বোধহয় রাস্তার কয়েকজন কৌতূহলী লোকের নজর এড়াতে। গড়িয়ায় নেমে কোথায় যাবো? মাথাটা ঘুরছে। কল্যাণ যেভাবে মেরেছে। কানের কাছটা ফুলে উঠেছে। চুল ধরে টেনে এলোমেলো অজস্র চড়। শিক্ষিত, মার্জিত স্বামী। মানুষটাকে দেখলে কি বিশ্বাস করবে কেউ সে বউকে মারে? এত রাত্তিরে এভাবে ঘর থেকে বার করে দেয়?

একটা সাইকেল রিক্সা দেখতে পেলুম। রিক্সওয়ালা হর্ন বাজাচ্ছে। মেয়েকে কোলে নিয়ে আমি উঠে পড়লুম রিক্সায়। কিন্তু যাবো কোথায়? হঠাৎ মনে হল, এখানেই তো খানিকটা দূরে এগিয়ে গেলে এক সাধুর আশ্রম। অনেকদিন আগে একবার এসেছিলাম। অস্পষ্টভাবে এখনো মনে পড়ে জায়গাটা। দীপানন্দের আশ্রমে চল। আমি সংক্ষেপে বলি।

আমার মুখের দিকে একটু অবাক হয়েই বোধহয় তাকায় রিক্সাওয়ালা।

"এত রাতে সেখানে যাবেন?"

"চল, আমার দরকার আছে।" সংক্ষেপে বলে আমি হারিয়ে যাই অকূলপাথারে।

নীচের রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে ডানদিকে একটা মেঠো রাস্তা ধরে এগোয় রিক্সা। চারিদিকে অল্পস্বল্প জঙ্গল আর বাঁশঝাড়। শেয়াল ডাকছে। সেই কয়েক বছর আগের মত এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে মন্দিরটা। খানিক দূরে আলো দেখতে পেলুম। মন্দিরের পাশেই কয়েকখানা ঘরঅলা একখানা একতলা বাড়ি থেকে আলো ছিটকে আসছে। ওখানেই তো দীপানন্দ থাকতেন। শাস্ত্র আলোচনা

করতেন চওড়া বারান্দাটায় বসে। ওঁকে ঘিরে বসে থাকত শিষ্যরা। দীপানন্দ ভাল কীর্তনও গাইতে পারেন। আমি ওঁর কীর্তন শুনতে এসেছিলুম একবার। বড় ভাল লেগেছিল। ভেবেছিলুম আবার আসব। কিন্তু আসা হয়নি। আজ যে এভাবে উনি আমায় টেনে আনবেন ভাবতে পারিনি। আমার হাত ধরে যেতে যেতে মেয়ে কেমন ভয় পাওয়া চোখে বলল, "আমরা কি আজ রাতে এখানে থাকব মা?"

আমি কোন উত্তর দিই না। কান্নায় আমার বুক ফেটে যায়। ভাড়া নিয়ে চলে যায় রিক্স। শোনা যায় অনেক দূর থেকে তার হর্ণ।

দীপানন্দের ঘরের জানলায় উঁকি মেরে দেখি, উনি নেই। ওঁর বিগ্রহের সামনে প্রদীপ জ্বলছে। অন্যান্য ঘরেও আলো জ্বলছে। মৃদু কথাবার্তা ভেসে আসছে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে মাথা রেখে আমি চোখ বুজলাম। আমার দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমার কান্না দেখে, আমার মেয়েও হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

"বাড়ি চল মা, বাড়ি চল।"

আমার মেয়ের কান্না শুনেই কি-না জানি না, ওদিকের ঘর থেকে দীপানন্দের এক শিষ্য বেরিয়ে এলেন। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা বড় বড় চুল। বুক পর্যন্ত লম্বা ঘন দাড়ি। অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্তির মত আস্তে আস্তে উনি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। আমি ওঁকে চিনতে পারলুম। উনি শ্বেতানন্দ। দীপানন্দের প্রধান শিষ্য। আশ্চর্য হয়ে উনি বললেন, "কে?"

আমি কি পরিচয় দেব, কি বলব কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমার মুখের কথা হারিয়ে গেল। বোবা চোখে শুধু আমি একবার তাকালুম। আমার মেয়ে তখনো কাঁদছে। উনি রূপ্‌সিকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন, "কেঁদো না মা," তারপর আমায় বললেন, "আসুন মা, আশ্রমে এসে বসুন। এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা বিপজ্জনক। সাপ-খোপ থাকা বিচিত্র নয়।" আমি জানতে

চাইলুম দীপানন্দ এখানে আছেন কি-না ? উনি বললেন, "তিনি এখন উড়িষ্যায়।"

আমার মনটা কেমন মুষড়ে গেল। ভাঙ্গা মন নিয়ে মেয়ের হাত ধরে আমি ওঁর পেছনে পেছনে এগুতে লাগলুম।

কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা বারান্দা। রেলিঙের গেটে মস্ত একটা তালা ঝুলছিল। শ্বেতানন্দ তালা খুললেন চাবি দিয়ে। আমায় বললেন, "আসুন মা, বসুন।" উনি একটা মাদুর পেতে দিলেন। আমি বসলুম। গরমের সময়। গাছ-গাছালির হাওয়া আসছিল প্রচুর। বুনো গন্ধ আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করছিল মাঝে মাঝে। খানিকটা দূরে আর একটা আসনের ওপর বসলেন শ্বেতানন্দ। রূপ্সিকে কোলে নিয়ে আদর করে আমার দিকে তাকালেন। "আপনার আসার কারণটা বুঝতে পারলুম না।" উনি একটু থেমে বললেন, "আপত্তি না থাকলে আমায় বলতে পারেন মা। যদি কোন কারণে বিপদগ্রস্ত হয়ে থাকেন তো আমায় জানাতে পারেন। বিপত্তারিণী দয়াল শ্রীমধুসূদনের আশ্রমে যখন এসে পড়েছেন, আপনার আর কোন ভয় নেই।"

ওঁর ভরাট গাম্ভীর্যময় গলার স্বর আমার মনকে উদাস করে দিল। মনে হ'ল, আমি ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি। শুধুই লাঞ্ছনা আর অপমান ছাড়া যে সংসার আমায় কিছুই দিতে পারেনি, কি হবে আমার সেই সংসার দিয়ে ? আমার মনের মধ্যে পর পর ভেসে উঠেছিল আমার স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণ। ঘরে ফেরার টান, ঘরের স্মৃতিবিযুক্ত চিহ্ন কোন মোহই আমার আর থাকছিল না। আমার সঙ্কোচ ক্রমেই কেটে যাচ্ছিল। আমি এই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীটির কাছে আমার মন মেলে দিলুম। বললুম, "জীবনের প্রতি আমার আর কোন লোভ নেই। শুধু এই ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে আমি বড় বিব্রত অসহায়। স্বামীর কাছে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছেই নেই। এতগুলো বছর ধরে যে মানুষটাকে আমি ভালবাসলুম, সেই মানুষটার আমি কোনদিন আপন হলুম না। সেই অনাদর আর উপেক্ষার সংসারে আমি আর ফিরতে চাইনে বাবা।"

হাসলেন শ্বেতানন্দ। বললেন, "তা হয় না, মা। ওটা আপনার অভিমানের কথা। মেঘ সরে গেলেই দেখবেন আকাশ আবার পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আমি আপনার মধ্যে এখনো বন্ধনের টান দেখতে পাচ্ছি। সংসারের কাছে এখনো আপনার অনেক প্রত্যাশা। আপনি ঘরকেই ভালবাসেন মা। যিনি ঘর চান, সংসার চান, তাঁর সেখানে ফিরে যাওয়াই ভাল। অভিমানবশতঃ দূরে সরে যাওয়াটা ঠিক নয়।"

শ্বেতানন্দের কথা আমায় অবাক করল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় আমার কপালের দিকে তাকিয়ে শ্বেতানন্দ বললেন, "তবে আপনার জীবনের মোড় ঘুরবে। আরো কিছুদিন পর।"

আশ্রমের বারান্দায় তুটি ছোট মেয়ে সেদিন সারারাত পাহারা দিল আমায়। রূপ্‌সি ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি ঘুমোইনি। শ্বেতানন্দের কথাগুলো আমার মনের মধ্যে কেবলই তোলপাড় করছিল। রাত আমার ফুরোতে চাইছিল না, পাশের ঘরে অন্য সন্ন্যাসী তু'জন ধ্যানে বসেছিলেন। সেই তু'জন সন্ন্যাসীর মধ্যে একজন শ্বেতানন্দ। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, উনি আমায় বুঝতে পারেন নি। সংসার যে আমি সত্যিই চাইনে।

পরদিন খুব ভোরে শ্বেতানন্দের সঙ্গে দেখা হ'ল আবার। আশ্রমের পাশেই ফুলবাগান-এ উনি ঘুরছিলেন। প্রতিদিন ভোরে নাকি বেড়ানো অভ্যাস। আমায় দেখতে পেয়ে হাসি হাসি মুখ করে বললেন, "আপনার ঘুম হ'ল মা?"

আমি বলি—"না।"

উনি বললেন, "বাড়ি ফিরে স্নানটান করে ঘুম লাগান। শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। মনমরা হয়ে মোটেই থাকবেন না। ক'দিন পরে এসে আমায় জানাবেন, আপনি কেমন আছেন।"

ওঁর কথার মধ্যে স্নেহ ঝরে পড়ল। বাড়ি ফেরার মত মন তখনো আমার তৈরী হয়নি। তাই আমি চুপ করে রইলাম।

শ্বেতানন্দ বললেন, "সংসারে সবাই সব কিছু পায় না মা। অশান্তির

বেদনা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে। এক-একজনের মধ্যে এক-এক ধরনের কান্না। সে তো ঈশ্বরের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশের রাস্তাটা আপনার মধ্যেই রয়েছে। খুঁজে নিতে হবে।"

আমি বলি, "কিন্তু যে বাড়ি থেকে আমার স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছেন, সেই বাড়িতে আমি ফিরব কি করে? এত বড় অপমানের পরও আপনি এ কি বলছেন?"

শ্বেতানন্দ আমার চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রাখেন। বলেন, "আজ ফিরে গিয়ে দেখুন আপনার স্বামী অন্য মানুষ হয়ে গেছেন।"

শ্বেতানন্দের কথায় আমার মনের পরিবর্তন হয় না তবু। মনে হয়, ওঁরা তো সন্ন্যাসী। জাগতিক কোন সুখ-দুঃখ যাঁদের আর স্পর্শ করতে পারে না, তাঁরা ওই সব বলতে পারেন। কালকের ওই অপমানের পর ও-বাড়িতে ফেরা আমার পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। কিন্তু কোথায় যাব? কি করব? কিছুই মাথায় আসে না।

মাথার ওপর দিয়ে চৈত্রের রুক্ষ হাওয়া বয়ে যায়। পায়ের তলার মাটি গরম। বেলা ১২টার ঝাঁজালো রোদে আমি এক বন্ধুর বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ি। বন্ধুর বাড়ি বালীগঞ্জে। ওরা তো আমায় দেখে হৈ হৈ করে ওঠে। "কি ব্যাপার, তুমি? এসো, এসো।"

রোববারের দুপুর। ওদের বেলা কাটছে গড়িয়ে গড়িয়ে। বসার ঘরে তখনো রীতিমত আড্ডা। সাহিত্য, রাজনীতি, জ্যোতিষশাস্ত্র সব কিছুতেই ওদের উৎসাহ। কাপের পর কাপ চা আসছে রান্নাঘর থেকে। বন্ধু বুনি আর ওর স্বামী সরিৎ দু'জনেই বোধহয় লক্ষ্য করল আমার শুকনো চেহারাটা। অনিদ্রায় কেটেছে গত রাত। চোখের জল থেমে গেলেও পলি রেখে গেছে চোখের কোণে। আশ্রমের কলের জলে ধুয়েও যা আমি নিশ্চিহ্ন করতে পারিনি। জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় ওরা—"তুমি একা? কর্তা কোথায়? আসেননি?"

ওদের কৌতূহলী চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বিব্রত বোধ করতে থাকি।

বুনি বোধহয় অনুমান করে কিছু। ও আমার হাত ধরে শোবার ঘরে নিয়ে যায়। সরিৎ আমার মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে। বলে, "বাবাকে পাকড়াও করে নিয়ে এলে না কেন রূপ্‌সি ?"

"বাবা তো রাগ করেছে।" রূপসি বলে ফেলে।

আমি ওর কথা চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলি, "না না, রাগ-টাগ নয়। ওর কিছু কাজ-কম্ম রয়েছে, ও আজ খুব ব্যস্ত।"

সরিৎ হাসে। বুনিও হাসে। বলে, "বুঝতে পেরেছি, দাম্পত্য কলহ। আমরা ভাব করিয়ে দোব।"

আমি চেষ্টা করেও হাসতে পারি না। সরিৎ বলে, "তাই বুঝি পালিয়ে এসেছ বন্ধুর বাড়ি। বেশ করেছ। তবু তো তোমার আসা হল। বুনিও গত সপ্তাহে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে দিদির বাড়ি কেটে পড়েছিল।"

আমি একটু হাসি। মনে মনে ভাবি, তোমাদের ব্যাপার আর আমার ব্যাপার তো এক নয়।

বুনির কোন ছেলেমেয়ে নেই। ও যত্ন করে রূপ্‌সিকে স্নান করায়, খাইয়ে দেয় নিজে হাতে। আমি শাওয়ার খুলে স্নান করি বুনির বাথরুমে। স্নান সেরে বুনির কাপড় পরি। বুনি আমায় সাজিয়ে দেয়। আমি চুপচাপ বসে থাকি আদুরে মেয়ের মত বুনির সামনে। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে পুতুল খেলেছি। পুতুলের বিয়ে দিয়েছি। আজ এতদিন পর বুনির কাছে এসে আমি আবার ছেলেবেলার গন্ধটা ফিরে পাই। বড় আপন মনে হয় বুনিকে। গত রাতের গ্লানি ভুলে আমি যেন কিছুটা সহজ হয়ে উঠি। কিন্তু স্বামীর বিষয় কোন কথাই হয় না বুনির সঙ্গে। বুনিও কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

খাবার টেবিলে সরিৎ বলে, "কল্যাণকে একটা টেলিফোন করে দিই, ও চলে আসুক লাঞ্চে।"

বুনিও উৎসাহে মাথা নাড়ে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

ওরা দুজনেই হাসিমুখে তাকায় আমার দিকে। আমার সম্মতি চায়। কিন্তু আমায় তখন ফ্যাকাশে দেখায়। ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিনে। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বুনি বলে, "থাক, কল্যাণ আরও কিছুক্ষণ একা বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করুক।" বুনি হেসে ফেলে।

সরিৎ বলে "তোমরা মেয়েরা বড় ক্রুয়েল। বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করুক বললেই হ'ল? ও বেচারী হয়ত এখন পাগলের মত হয়ে বউ খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

খুশিতে নেচে ওঠে বুনির চোখ। সেই ছোটবেলার মজা পাবার মত চোখ নিয়ে বলে, "বেশ হয়েছে। মাঝে মাঝে তোমাদের পুরুষ জাতটাকে অমনি ভোগাতে হয়।"

"হ্যাঁ, ভোগানো বলে ভোগানো। তুমি সেদিন আমায় এমন করে ভুগিয়েছিলে! লালবাজারে ডায়েরী করলে বুঝতে মজা। একবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে যেত।"

বুনি হাসতে থাকে।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলুম। গত রাতের ঘটনা এবং আরও অন্যান্য দিনের আমার বাড়ির ঘটনাগুলো আমায় কুরে কুরে খাচ্ছিল। বুনিদের এই মধুর দাম্পত্য-কলহের সঙ্গে যার কোন মিল নেই। আমি জানি, কল্যাণ আমায় খুঁজতে বেরুবে না। ও ওর জেদ নিয়ে বসে থাকবে।

বুনি, সরিৎ ছাদে শোয়। ফ্ল্যাটের দরজায় তালা ঝুলিয়ে ওরা মাদুর বালিশ নিয়ে রাত্তিরে সোজা ছাদে চলে যায়। গরমে ঘরে টেকা অসহ্য হয়ে ওঠে। সেদিন রাত্তিরে আমি, রূপ্‌সি আর বুনি একসঙ্গে শুই। সরিৎ খানিকটা দূরে আর একটা মাদুর পেতে শোয়।

আমরা অনেক রাত অবধি গল্পগুজব করি। ওরা ঘুমিয়ে পড়লে আমি জেগে থাকি। আমার বাড়ির চেহারা মনে পড়ে শুধু। যেখানে বুনি আর সরিতের মত সুখ নেই। আমায় দেখতে না পেলে

সরিতের মত কল্যাণ এমন অস্থির হয় না। আমাদের সম্পর্কটা যেন ভাড়াটে আর বাড়িওলার মত। হয়ত তার চেয়ে সামান্য উন্নত। কল্যাণ ওর বাড়িতে আমায় থাকতে দিয়েছে। খেতেও দেয়। আর তার বদলে আমি ওর ঘর-সংসার আগলাই। কল্যাণ আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে আগে হুঁ হ্যাঁ করত, আজকাল তাও করে না। ওর ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা রুক্ষতা প্রকাশ পায় যেন আমি ওর কেউ না। আমার ওপরে ওর কোন দায়িত্ব নেই। আমাদের মধ্যে ক্রমেই দূরত্ব তৈরী হচ্ছিল। অভিমানে আমিও সরে যাচ্ছিলাম দূরে। বুঝতে পারিনি অভিমান করার মত সম্পর্ক এখন আর আমাদের নেই। কল্যাণ আমায় চায় না। সহ্য করতে পারে না আমায়। তাই আমার অভিমান বোঝার মত মানসিকতা ওর নেই।

আমি যতই দূরে সরে যাচ্ছিলাম ততই ওর সুবিধে হচ্ছিল। ও আমার সঙ্গে কথা বলছিল না। একটা বাচ্চা মেয়ে কাজ করে। ও তার কাছেই ওর প্রয়োজনীয় জিনিস চেয়ে নেয়। সংসারে এটা-ওটা যা দরকার আমিও ওই বাচ্চা মেয়েটির মাধ্যমেই কল্যাণকে জানিয়ে দিতুম। নিজের সংসারে পরের মতন থাকা যায় না। আমি হাঁপিয়ে উঠতুম। আমার কান্না পেত।

আমার চোখের জল কল্যাণের মন ভেজায় না। আমি বুঝতে পারি, কল্যাণ আমার মোহে পড়েছিল। কল্যাণের মাসিই এই সর্বনাশটা করল। আমার সঙ্গে কেন ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল? কেন কল্যাণের প্রশংসা করে করে আমায় পাগল করেছিল? কি স্বার্থ ছিল মাসির বুঝতে পারি না। আর আজ আমার ঘর ভেঙেই বা ওঁর কি লাভ হল? তাও বুঝি না।

আমি জানি, কল্যাণ আমায় বোঝা মনে করছিল। সেই বোঝাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও আজ নিশ্চিন্ত। ও আমায় কোনদিন খুঁজবে না। আমি যদি না ফিরি, সেটাই হবে ওর কাছে মঙ্গল।

পরদিন সকাল থেকে আমার মনটা ছিল বিষণ্ণ। আমার আর

ভাল লাগছিল না ওদের সংসারে থাকতে। বুনি, সরিৎ বোধহয় আঁচ করতে পেরেছিল, আমার মধ্যে কোন দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে। কেননা, আমার মেয়ে রূপ্‌সির এলোমেলো কথায় ওরা জেনে গেছে, কল্যাণ আমায় মারধোর করে। কল্যাণের এক মাসি আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসেন। রূপ্‌সি তাঁকে দিদি বলে। ওই দিদি এলেই বাবার সঙ্গে মায়ের গোলমাল বেড়ে যায়। দিদিটা আর বাবা ছাদে বসে বসে ওষুধ খায়। বড় বড় বোতলের ওষুধ। আমি আমার পাঁচ বছরের মেয়ের মুখ বন্ধ করতে পারিনি। ও যে চোখের সামনে দেখেছে, বাবা তার মাসিকে কত ভালবাসেন। বাবা তাঁকে নিয়ে বেড়াতে যান, তাঁকে জিনিস কিনে দেন। তিনি এলে বাবা বেশী হাসেন। কথা বলেন, গল্প করেন, আর রূপ্‌সির মায়ের সঙ্গে শুধু ঝগড়া। তাঁকে তাড়িয়ে দিতে চান বাবা।

সকালে চায়ের টেবিলে সরিৎ আমায় খুব সহানুভূতির চোখে দেখছিল, প্রচুর কৌতূহল নিয়ে বুনিও দেখছিল আমায়। ওরা হয়ত কিছু শুনতে চাইছিল আমার মুখে। বুনি বলল, "কল্যাণ হয়ত আজ বিকেলের দিকে চলেও আসতে পারে।"

আমি চুপ করে রইলুম। বুঝতে পারছি, বুনি কথা বার করতে চায়।

কল্যাণ বলে, "সবাই তোমার সরিৎ বোস নয়।"

বুনি চোখ কপালে তুলে বলে, "সত্যি?"

আমি তো বুঝতেই পেরেছি ওদের দাম্পত্য জীবনের গভীরতা। তাই ওদের দু'জনের এই লোক-দেখানো ভাব সেই মুহূর্তে সহ্য করতে কষ্ট হল।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বুনি কথা ঘুরিয়ে নিল। ও বলল, "এতগুলো ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে, কল্যাণের একটা খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।"

সরিৎ বলে, "দেখতেই তো পাচ্ছো নিল না। অত বলার কি আছে?"

কল্যাণের ওপরে আমার এখন কোন মোহ রাখা ঠিক নয়। তবু পরের মুখে স্বামীর নিন্দে সহ্য করতেও কষ্ট হয়। এখানে উঠেই আমি ভুল করেছি—আমার মনে হয়। তার চেয়ে যদি শ্বেতানন্দের আশ্রমেই থেকে যেতুম।

পাঁচদিন হয়ে গেল আমি রয়েছি বুনির বাড়িতে। কল্যাণ সত্যি সত্যি এল না। রূপ্‌সি আজকাল ঘ্যান ঘ্যান করে। "বাড়ি চল মা, বাড়ি চল।" আমি ওকে বোঝাতে পারি না। আমাদের কোন বাড়ি নেই মা। পরক্ষণেই মনে হয়, কেন নেই? কল্যাণ কি যা ইচ্ছে তাই করবে নাকি? ওটা তো শুধু কল্যাণের একার বাড়ি নয়। আমাদের মেয়ের, আমার, কল্যাণের। একথা জেনেও যে মানুষটা নিষ্ঠুরতা করে, সেই মানুষটার ওপরে ঘেন্না ছাড়া আর তো কিছুই আসে না। নিশুতি রাতে যে মানুষটা তার স্ত্রীকে, মেয়েকে বার করে দেয়, তাদের খোঁজ নেয় না, সেই মানুষটার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত আমি ভেবে পাইনা। জোর করে বাড়ি দখল করব? দূর!

বুনি আমার সব থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু। ও একবার বুনির কাছে খোঁজ নিতে পারত। ওর ভাবা স্বাভাবিক, বুনি নিশ্চয় জানবে, আমরা কোথায় আছি? বুনির বাড়ি টেলিফোন আছে। কল্যাণ একটা ফোনও করতে পারতো। আমার জন্যে না হোক, মেয়ের জন্যে।

আমায় নিয়ে বুনি এখন বেশ বিব্রত বোধ করছে। আমারও খুব লজ্জা করছে, ওর বাড়িতে এতদিন পড়ে থাকতে।

বুনি দুপুরবেলা মার্কেটিং-এ বেরিয়েছিল। আমায় সঙ্গে নিতে চাইল। শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে আমি বাড়ি থেকে গেলুম। ও চলে যাবার পর আমি এলোমেলো দু-একটা রিঙ করি। বিভিন্ন অফিসে, স্কুলে। যদি কোন চাকরী জুটে যায়। চেনা-জানা কেউ কেউ বলে, "তোমার টাকা খাবে কে? একটা তো মেয়ে নাকি আরও কোন পরিকল্পনা আছে? তোমার অত বড় বাড়ি। তোমার স্বামীর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।"....দুঃখে আমার হাসি পায়

আমি মুখ ফুটে বলতে পারি না, সে টাকায় আমার অধিকার নেই।

কল্যাণের মাসি আমার চেয়ে কিছু বড়। বেশ ভাব ছিল আমাদের। ও আমায় প্রায়ই কল্যাণের গল্প করত। শেষে একদিন কল্যাণের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিল। আমি বুঝতে পারি নি, কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা আমার সঙ্গে মিশেছিল। বুঝতে পারি কিছুদিন পর। কল্যাণের মাসি সরাসরি আমায় বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসল। "এই, তুমি কল্যাণকে বিয়ে করবে?" বেশ মজা লেগেছিল আমার। "ওকে আমি তো বুঝতেই পারি নি, কতটুকু পরিচয় আমাদের? এই সামান্য আলাপে বিয়ে?" মাসি বলল, "বেশী বুঝে বিয়ে করলে, পরে আর ওকে জানবার আগ্রহ থাকবে না। বিয়ে তো তোমায় করতেই হবে। ওকেই করে ফেল।"

"বা রে বেশ তো আব্দার।"

সেই আব্দারই যে জয়ী হবে ভাবতে পারি নি। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। ঘটকালীটা মাসিই করেছিল। আমার বাবা-মাকে বলে, কল্যাণের বাবা-মাকে বলে, একেবারে এক মাসের মধ্যেই আমার পদবি পাল্টে দিল।

কল্যাণের বাবা-মা বাইরে থাকতেন। আমি আর কল্যাণই শুধু কলকাতায়। মাসি প্রায়ই চলে আসত আমাদের কাছে। পড়ে থাকত দিনের পর দিন। আমি খুশিই হতুম। আবার অবাকও হতুম। কিন্তু ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতুম না। আমি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি, কল্যাণের সঙ্গে ওঁর কোন অবৈধ সম্পর্ক আছে। মাস ছ'য়েকের মধ্যেই বুঝতে পারলুম আমার কপাল পুড়েছে। মনের মধ্যে কেবল খচ্ খচ্ করে। মাসি এলেই আমার সন্দেহ হয়।

কল্যাণের সঙ্গে এই নিয়ে অশান্তি হতো। তারপর আর হতো না। আমি মুখ বুজে সয়ে যেতুম। লোক জানাজানি হবে। একটা বিশ্রী লজ্জা আমায় পেয়ে বসত।

আজকাল সরিৎ সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরলে আমাদের চায়ের আসর আর অমন করে জমে না। সেই আগের মত মেজাজ নিয়েই সরিৎ হেসে আমায় বলে, "সোহিনীর কি খবর ? আজ তোফা ঘুম লাগিয়েছ মনে হচ্ছে ?" "ঘুম ?" আমি অবাক হই। হাসি। বলি, "কেন। খুব ফ্রেশ লাগছে নাকি ? ক্রেডিটটা তাহলে বুনিকেই দিতে হয়। আমার বন্ধুটির যা যত্ন ....!" বুনি গম্ভীর হয়ে যায়। ও হাসতে পারে না। সরিতের চায়ের কাপে চিনি কম হলে আমি যদি এক চামচে চিনি মেশাতে যাই, বুনি তাড়াতাড়ি ছুটে আসে। ও আমার হাত থেকে চামচে কেড়ে নিয়ে নিজে চিনি মিশিয়ে দেয় সরিতের কাপে। যদি সরিৎ কোনদিন বলে, "সোহিনী, কত্তার ধ্যান করতে করতেই তো শরীর খারাপ করে ফেললে। রান্না-টান্না ভুলে যাবে দেখছি।" "হ্যাঁ, ভুলে যাবে আর কি ?" আমার জবাবটা বুনিই দিয়ে দেয়। যদিও ওর সেই গলার স্বরে কৌতুক থাকে না। সরিৎ বলে, "আজ সোহিনীর পরীক্ষা হয়ে যাক। মাংসটা রান্না করে ও দেখাক যে, ও রান্না ভুলে যায় নি এখনো।" বুনি তখন স্পষ্টই ওর রাগটা প্রকাশ করে ফেলে। সরিৎকে বলে, "তোমার মেয়েলী স্বভাব আমার মোটেই পছন্দ হয় না। আমার বন্ধু রান্না ভুলে গেল কি না গেল সেটা আমি বুঝব।" সরিৎ হাসে। আমায় বলে, "দেখলে সোহিনী। তোমার বন্ধুটি আজকাল তোমায় রীতিমত রাইভ্যাল মনে করে।" বুনি এ কথা শুনে মোটেই হাসে না। ওর মুখখানা শুকিয়ে যায়। ও ভীত চোখে স্বামীকে দেখে। চালাক হবার চেষ্টা করে। বলে, "সোহিনী মোটেই বোকা নয়। বন্ধু বিচ্ছেদের ফাঁদে ও পা দেবে না।" বুনি একথা মুখে বললেও ওর কণ্ঠস্বরে জোর থাকে না। আমি বুঝতে পারি, বুনি আমায় ভয় পেতে শুরু করেছে। আমার খারাপ লাগে। বুনিকে আমি যে এখনো বড় ভালবাসি।

রূপ্‌সিকে নিয়ে আমি এখন বুনির ফ্ল্যাটেই ঘুমুই। বুনি আর সরিৎ ছাদে শোয় রাত্তিরে, সেই আগের মত। প্রথম দুদিন ওদের সঙ্গে

ছাদে শোবার পর, তৃতীয়দিন আমিই বলেছি, 'তোরা ছাদে যা। আমি রূপ্‌সিকে নিয়ে নীচেই থাকি"। বুনি আপত্তি করেনি।

বিকেলের দিকে সরিৎ যেদিন তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরে, সেদিন ওর বায়না, "চল একসঙ্গে সবাই মিলে হৈ-হৈ করে আসি।" একথা শুনে বুনি খুশি হয় না। আমি সরিৎকে বলি, "তোমরা দু'জনে ঘুরে এস। আমার বেরুতে ইচ্ছে করছে না।" সরিৎ বলে, "রিফিউজ করলে আমার প্রস্তাব? গঙ্গার ঘাটে এখন যা হাওয়া না?" ও ছেলে-মানুষের মত গলা করে বলে। বুনি সরিতের দিকে তাকায়। আক্রোশ ফেটে পড়ে ওর চাউনির মধ্যে। আর তখনই আমি ভয় পাই, আমার বন্ধুবিচ্ছেদ হবে না তো? না না। বুনি যে আমার সেই কবেকার বন্ধু, যখন আমরা কাদা-মাটি মেখে রান্না-বাটির খেলা খেলতুম, সেই তখন। আমি তাড়াতাড়ি বলি, "এই না, তোমরাই ঘুরে এসো সরিৎ। তোমাদের মধ্যেই আমার দেখা সম্পূর্ণ হোক।" সরিৎ হাসতে থাকে। আর আমি অবাক হয়ে দেখি, আমার ছেলেবেলার বন্ধু, সেই বড় আদরের বুনি একবারও আমায় যাবার জন্যে অনুরোধ না করে "এই এস"; বলে বরকে টেনে নিয়ে চলে যায়।

আমার তখন কত কথা মনে পড়ে। বুকের মধ্যে তোলপাড় করে কথা, কথা। সপ্তাহখানেক হল রূপ্‌সিকে নিয়ে আমি বুনির বাড়িতে পড়ে আছি। বুনি এখনও সোজাসুজিভাবে আমায় কিছুই বলছে না। পাকে-প্রকারে আমায় চলে যাবার কথাই যেন বলছে ও। কল্যাণের সঙ্গে এই বাড়িতেই বুক ফুলিয়ে এসেছি আমি। বুনি আমায় একটি দিন রাখবার জন্য কত জোর করেছে। কিন্তু আমি থাকি নি। সরিৎ ঠাট্টা করে বলেছে, "কল্যাণ, তোমার বউকে ক'দিন রেখে যাও, সোসাইটিতে তোমার বউ একটা গ্ল্যামার।"

একথা সত্যি, বুনির চেয়ে আমি অনেক সুন্দরী। আমার ফিগার তাকিয়ে দেখার মত। আজ এই যৌবনের শেষ প্রান্তে এসেও অনেক মেয়ের চোখেই আমি ঈর্ষার আগুন দেখি।

সরিৎ যখন আমার প্রশংসা করত বুনির কিন্তু তখন একটুও রাগ হত না। বুনি দাম্ভিক মেয়ের মত হেসে বলত, "আমার বন্ধু যদি আমার প্রক্সি দিয়ে তোমার গ্ল্যামার বাড়ায়, আমি তাতে খুশিই হব।" কিন্তু সেই বুনি আজ....?

আমার নিজের সংসারের কথা মনে পড়ল। আমার নিজের হাতের সাজানো সংসার। সেখানে ফিরে গেলে কল্যাণ হয়ত কিছুই বলবে না। আইনগত বিচ্ছেদ না হলে সে সংসার থেকে আমায় তাড়ানোর অধিকারও তো তার নেই। আমি কি ফিরে যাব সেখানে? অন্তত যে ক'দিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারি। বুনির বাড়িতে পড়ে থাকার চেয়ে সেটা বরং অনেক সম্মানের। কল্যাণের কাছ থেকে পাওয়া নিষ্ঠুর অপমানগুলো ফিকে হয়ে আসতে লাগল মনের ভেতরে।

॥ রূপসী ॥

মা আজকাল প্রায়ই আমায় বলছেন, আমার পুরুষ বন্ধুর মধ্যে কাকে আমার সবচেয়ে বেশী পছন্দ, সেই কথাটা ওঁকে খুব তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিতে। কিন্তু আমি কি বলব, কার কথা জানাব বুঝতে পারি নে। আর মা কি জন্যে বলছেন, তাও তো আমি জানি। খুব তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিতে চান। আমি তাই আজকাল মাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলি। খুব অদ্ভুত লাগে, মা আমায় তাড়ানোর জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। আমি কি মায়ের গলগ্রহ? একেক সময় ইচ্ছে করে মাকে এসব জিজ্ঞেস করি। বলি, এই উনিশ বছর বয়সেই আমি নিজেকে ফুরিয়ে ফেলতে রাজী নই। বিয়ে মানে নিজেকে ফুরিয়ে ফেলা। নিজের যা কিছু ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্যবোধ সব অন্যের কাছে বিসর্জন দেওয়া। কিন্তু মাকে এ কথা বলার সাহস হয় না। আর আমার বন্ধুদের মধ্যে কাকেই বা বেছে নেব আমার স্বামী হিসেবে? বন্ধুরা স্বামী হবে। ভাবতে পারিনে।

কাঁচ লাগানো কাঠের লম্বা আলমারীটার সামনে দাঁড়িয়ে আমি এখন শাড়ীর কুঁচি ঠিক করছি। খয়েরী রঙের এই ডুরে শাড়ীটা পরলে আমায় নাকি খুব ভাল দেখায়। রূপেন বলে। ও বলে, "তোর যেদিন আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকবে, তুই সেদিন এই শাড়ীটা পরে আসবি।" আমি হেসে বলেছি, "অদ্ভুত তো। তোর সঙ্গে যতদিন আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকবে, এই একই শাড়ী?" "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই একই শাড়ী। আমি তোদের মত নিত্য নতুনের পিয়াসী নই।" আমার চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে। রূপেন তখন কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, "রূপ্‌সি মানেই আমার কাছে খয়েরী রঙের ডুরে একখানা শাড়ী।" "যেদিন শাড়ীটা ছিঁড়ে যাবে, সেদিন?" রূপেন বলে, "সেদিন দেখা যাবে, এর জুড়ি যদি আর একটা....।" ও অর্থপূর্ণ হাসি হাসে। আমি ছেড়ে দিইনি। বলেছি, "তবে যে বড়াই করেছিলি, নতুনের পিয়াসী তুই নয়?........"

রূপেন হাসে, "আজ্ঞে স্যার, নতুন কথাটা বলার আগে আমি নিত্য শব্দটা বোধ হয় যোগ করেছি?" "চালাকি।" আমি হেসে রূপেনকে দেখি।

আমার মনে হয়, আমায় রূপেন অন্যভাবে চায়। আমরা যে সব বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিই, তাদের সবার থেকে আলাদা করে। এর নামই বোধহয় ভালবাসা। রূপেন আমায় ভালবাসলেও আমায় বুঝতে দেয় না। কিছুতেই স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না নিজেকে। "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" গোছের ভাব আর কি? আমি আর রূপেন আমরা দুজনেই দুজনের মন নিয়ে খেলি। কিন্তু মনের কাছে খোলা-খুলি হই না। এই খেলাতেই আমাদের আনন্দ। নিজেদের অস্পষ্ট করে রাখতে ভাল লাগে। স্পষ্ট করে তুললে তো হয়েই গেল। আমরা যে কোন প্রেমিক প্রেমিকার পর্যায়ে পড়ে গেলাম।

রূপেন আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলে। যেমন, "এই রূপ্‌সি, যদি সময় হয় গোটাচারেকের সময় আসিস কোয়ালিটিতে।"

"বালীগঞ্জ ফাঁড়ির কোয়ালিটি ?"

"ওই হ'ল আর কি ?"

"কেন কি দরকার ?"

"দরকার ছাড়া কি আসতে নেই ? তোর সঙ্গে গেঁজাব আর কি ?"

"অতনু, শ্রীময়ী, হীরক, ওদের বলেছিস ?"

"দূর। একগাদা ভিড় বাড়িয়ে কি হবে ?"

আমি চকিতে তাকাই অতনুর দিকে। অতনুর চোখ সামান্য গাঢ় দেখায়। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "ওদের ডাকলে, ওরা তো ওখানে মাছের বাজার লাগিয়ে দেবে।"

রূপেনের সঙ্গ আমার ভাল লাগে। তাই কথার তুবড়ি না ছুটিয়ে আমি ওর কথা রাখি।

কার্পেট মোড়া মেঝে, এয়ার কনডিশান ঘরে আলোছায়া ঘেরা পরিবেশে ঠাণ্ডা কফি নিয়ে আমরা বসে থাকি দুজনে।

রূপেন আমার বাড়ির কথা বিশেষ কিছুই জানে না। জানতে আগ্রহীও নয়। সেদিন হঠাৎ দুম্ করে ও বলে, "আন্দামানে চাকরী নিয়ে চলে গেলে কেমন হয় ?" আমি বলি, "ভালই হয়। তবে কোয়ালিটিতে তো আর আড্ডা মারা হবে না ?"

রূপেন হাসে, "আন্দামানে যদি তুই আর আমি আর একটা কোয়ালিটি বানাই ?"

"তোর সখ হ'লে তুই বানা। আমি বানাতে যাব কোন দুঃখে ?"

"কেন আমার দুঃখে ? রূপেনের চোখ হাসে। আমার চোখও হাসে। কয়েক মুহূর্ত হয়ত আমাদের কোন কথা হয় না।

এইভাবে আভাসে ইঙ্গিতে আমরা চলি। হাতে হাত রেখে ছুটে গিয়ে মিনিবাস ধরি। দুজনে পাশাপাশি বসতে না পেলে আমার মত ওরও হয়ত মন খারাপ হয়। কিন্তু সে মনের খবর চাপা থাকে আর একজনের কাছে।

এমনও হয়, হয়ত দিনের পর দিন দুজনের দেখাই নেই। আমাদের

পরিচিত আড্ডায় বন্ধুদের ভিড়ে রূপেনের মুখ দেখা যায় না। কিংবা আমিই অনুপস্থিত। যেদিন দেখা হয়, সেদিন আলাদা কোন কথা নেই। অনেকের অনেক মন্তব্য, আড্ডার স্রোতে মিশে গিয়ে আমি হয়ত চোরের মত ওকে দেখি। রূপেনও ধরা পড়ে যায় মাঝে মাঝে। ও আমার মন চোর। আমি ওর মন চোর।

কিছুদিন থেকে মা হয়ত আঁচ করতে চেষ্টা করছেন, আমার খুব ভাললাগা বন্ধুদের মধ্যে রূপেন এক নম্বর।

শ্রীময়ীদের কাছে মা একদিন খোঁজখবর নিলেন রূপেনের। রূপেনের বাড়িতে কে আছেন না আছেন, ওর বাবা কি করেন? কলকাতায় ওদের বাড়িটাড়ি আছে কিনা? না ওটা ভাড়া বাড়ি?

মা তো জানেন, এসব কথার উত্তর আমি একেবারেই দেব না। আমি বলব, "রূপেন আমার বন্ধু। ব্যস্, এই পর্যন্তই। ওর বাড়ির খবরে আমার দরকার কি?"

মায়ের নিজেরও রূপেনকে কম পছন্দ নয়। দীপঙ্কর, অতনু, হীরক এদের কেউ বাড়িতে এসে আড্ডা দিক মা চান না। কিন্তু রূপেন কিছুদিন না এলেই মা খবর নেন, "রূপেনকে অনেকদিন দেখছি না?" আমার ভয় হয়, মা রূপেনকে সোজাসুজি না বলে বসেন কিছু, "এই যে রূপেন তোমাদের বিষয় আমার কিছু কথা আছে?" অথবা "তোমাদের দুজনের সম্পর্ক কতটা গভীরতায় গিয়ে পৌঁছেছে?"

মায়ের পক্ষে এসব বলা অসম্ভব নয়। সোজাসুজি এ কথাও বলতে পারেন, "কবে বিয়ে করছ তোমরা?"

রূপেনের প্রসঙ্গ উঠলেই আমি মাকে এড়িয়ে চলি। আমি জানি, আমায় নিয়ে মা দারুণ সমস্যায় ভুগছেন। মোটামুটি পছন্দমত পাত্র পেলে উনি আমায় পার করে দেবেন। রূপেন সি. এ. পড়ছে। পাশ করলে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবে। মায়ের তাই রূপেনের ওপরে বড় লোভ। কিন্তু আমার? আমার লোভ ওর কেরিয়ারের ওপর নয়। ওর ওই আশ্চর্য মনটার ওপর।

যদিও রূপেনের মনের কতটুকু পরিচয়ই বা আমি পেয়েছি? মন দেওয়া নেওয়ার খেলাতেই বা আমরা কতটা গভীরতায় গিয়ে পৌঁছেচি? আমরা তো এখনো কেউ কাউকে পরীক্ষা করিনি।

মা বোধ হয় জানেন, এই খয়ের রঙের ডুরে শাড়ীর রহস্য। আন্দাজ করতে পারেন মনে হয়। এই শাড়ীটা পরা অবস্থায় অন্ততঃ বার তিনেক মা আমায় দেখেছেন রূপেনের সঙ্গে। আমরা হাঁটছি তো হাঁটছিই। আমাদের সে হাঁটা অনন্ত। সে রাস্তার বোধহয় শেষ নেই। সেই অন্তবিহীন পথে মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কখন শ্যামবাজারে পাঁচমাথার মোড়ে, কখন চৌরঙ্গীতে, কিংবা গড়িয়া-হাটায়। আমি আর রূপেন যতই সহজ ছন্দে চলি না কেন মায়ের চোখে ফুটে উঠেছে তার অন্যরূপ।

এসপ্ল্যানেডে ট্রাম গুমটির সামনের পার্কটায় আমি আর রূপেন মশলা মুড়ি চিবোচ্ছিলাম। পার্কের রেলিঙে পিঠ লাগিয়ে ঝড়ো আকাশের চেহারা দেখছিলাম দুজনে। পার্কের গাছগুলো হেলেদুলে অস্থির, বাতাসের তাড়নায় ধুলো, বালি, নোংরা কাগজ উড়ছিল। সামনের ছোট ছোট গাছগুলোর ঝোপের পাশে একটি দেহাতী মেয়েছেলে ঘুমোচ্ছিল; তার নাক ডাকছিল মোটা সুরের গর্জনে। রূপেন আর আমি খুব হাসছিলাম। অফিস ফেরৎ মানুষগুলো ছুটোছুটি করছিল। ওদের বাড়ি ফেরার তাড়া। ইলেকট্রিকের তারগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে যেন স্কিপিং খেলছিল। হাসতে হাসতে আমি হঠাৎ থেমে যাই। বলি, "আচ্ছা রূপেন, সামনের ওই ইলেকট্রিক তারটা যদি ছিঁড়ে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ে ওই মেয়েটির গায়ে?" রূপেন নির্বিকার ভাবে জবাব দেয়, "মরবে।"

"ওর কি নিশ্চিন্ত ঘুম তাই না?"

"বোধহয় মালটাল খেয়েছে।"

"মাল শব্দটা বিশ্রী। আমার সামনে আর কখনো বলিস না রূপেন।"

হাত ঘুরিয়ে নাচের ভঙ্গীতে রূপেন বলে, "তবে কি বলব সুরা?"

ওর হাতের মুদ্রা, বলার ভঙ্গী দেখে আমি না হেসে পারিনা। রূপেনের এই রগড়, এই মজা আমার খুব ভাল লাগে। আমি হাসতে থাকি। রূপেন বলে, "আর তারটা যদি ছিঁড়ে আমাদের গায়ে পড়ে, তবে কালই আমরা কাগজের একটা খবর হয়ে যাব। পার্কে যুবক যুবতীর মৃতদেহ। আহা, ফাইন! আমি তোকে এমনিভাবে জড়িয়ে থাকব রূপ্‌সি।" কথাগুলো শেষ হতে না হতেই রূপেন আমায় জড়িয়ে ধরে।

"এই, যাহ্‌, কি হচ্ছে?" আমি চোখ পাকিয়ে ওকে ধমকাই।

রূপেন হাসে, বলে, "ভবিষ্যতের খবর!"

"না, বাব্বা, এত তাড়াতাড়ি খবর হবার সাধ নেই আমার।"

"তবে সাধটা কি শুনি?"

রূপেনের কথার জবাব দেওয়া হয় না। পেছনে একটা চেনা গলায় আমার নাম শুনেই ফিরে তাকাই। দেখি! ট্রাম গুমটির নীচে দাঁড়িয়ে আমার মা ডাকছেন। আমি আর রূপেন উঠে দাঁড়াই। মা কাছে এগিয়ে এসে বলেন, "এই বিপদজ্জনক ঝড়ের মধ্যে তোমরা বসে আছো দুজনে!"

রূপেন ঘাবড়ানোর পাত্র নয়। ঝরঝরে হেসে ও বলে, "দেখুন মাসিমা, অনেক বার ট্রাই করে বাসে উঠতে না পেরে তাই এখানে আড্ডা মারছিলাম।"

ওর এই সোজাসুজি স্বীকারোক্তিতে মা না হেসে পারেন না। "ঝড়ের দাপটে মানুষ পালাচ্ছে, এটা কি আড্ডা মারার সময়? এস, এস।"

"ভালই হ'ল মাসিমা, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে। বেশ ট্যাক্সি করে ফেরা যাবে।"

মা ফের হাসেন ওর কথায়। "বেশ তো ছাখো না, যদি কোন ট্যাক্সি ধরতে পার।"

রূপেন ছুটে মনুমেণ্টের সামনে যায় ট্যাক্সি ধরতে।

আজ আবার আমার পরনে সেই একই সাজ। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন মা, "কোথায় চললে রূপ্‌সি?" "টিউশনিতে"। কথাটা বলেই আমি তাকাই আয়নায়। আমার কৃত্রিম নির্দোষ মুখটার দিকে তাকিয়ে ভাবি, ধরা পড়ে যাচ্ছি না তো?

"টিউশনিতে?" কেটে কেটে উচ্চারণ করেন মা, "তুমি তো মঙ্গল আর বৃহস্পতিবার যাও টিউশনিতে। শনিবার তো যাও না?"

"যাই না। আজ যাচ্ছি।"

"রূপ্‌সি, তুমি আমার সঙ্গে অমনি করে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।" মা রেগে ওঠেন। তখন আমি নরম গলায় বলি, "আমার ছাত্রীর পরীক্ষা তো। তাই ওকে........।" "ছাত্রীর পরীক্ষা? কি পরীক্ষা?" জজ সাহেবের মত মায়ের প্রশ্ন আমার বুকে এসে বেঁধে। এক মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে আর এক মিথ্যে বলতে হয় আমায়।

"ওই তো উইক্‌লি টেস্ট।"

আর কোন কথা না বলে মা চলে যান। আমার মনের মধ্যেকার আর একটা মানুষ আমার কাছে কৈফিয়ৎ চায়। কি দরকার ছিল আমার এই মিথ্যে বলার? যে মা ছিলেন আমার সব থেকে বড় বন্ধু সেই মায়ের সামনে আমি অভিনয় করছি। মনে পড়ে যায়, ছোটবেলার খণ্ড খণ্ড ছবি। "মিথ্যে কথা বলতে নেই রূপ্‌সি। তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল, আমায় কোনদিন মিথ্যে বলবে না?" "গা ছুঁয়ে বলছি না মা। এই তোমার গা ছুঁয়ে........।"

"মায়ের কাছে কোনদিন কোন কথা লুকোতে নেই। আমার গা ছুঁয়ে বলেছ কিন্তু। যদি কথা না রাখো, তাহ'লে কিন্তু আমি মরে যাব।" "না, না। তুমি মরে যাবে না মা।" আমি আমার ছোট হাতের থাবা দিয়ে মায়ের মুখ চেপে ধরেছি।

সেই আমি, এই বড় বেলাকার আমি নিজেকে আজ বোঝাই, যে অভিনয়, যে মিথ্যা জীবনে কোন ক্ষতি আনে না, বরং ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায়, সেই মিথ্যের প্রয়োজন আছে বই কি? রূপেনের সঙ্গে

এলোমেলো সময়টা কাটানোর মধ্যে দিয়ে আমি আমার আয়ু বাড়িয়ে চলেছি। নইলে এই পোড়খাওয়া জীবনের ক্ষত শুকোবো কি ভাবে?

আমি বেরিয়ে আসি। পুলিশের মত অনুসন্ধানী চোখে মা আমায় দেখতেই থাকেন।

বেরুনোর মুখে গেটের কাছে দেখা হয়ে যায় রাহুলবাবার সঙ্গে। ওঁর এক বন্ধুকে নিয়ে উনি ঢুকছেন। অফিস থেকে ফিরলেন মনে হয়। ঘামে নেয়ে অ্যাক্‌সা হয়েছেন রাহুলবাবা। মুখটা তেল তেল লাগছে। ওঁর হাতে ব্রীফকেস। আমি অনেকদিন পর এতো খুঁটিয়ে দেখলুম ওঁকে। ছোটবেলায় কত বায়না করেছি যে মানুষটার কাছে, যে মানুষটার হাত ধরে আমি অনেক পথ হেঁটেছি। ছুটির দিনে চিড়িয়াখানা, যাত্বঘর, ভিক্টোরিয়ায়........। চক্‌লেট মুখে পুরে ত্ব'জনে হি হি করে হেসেছি। রাহুলবাবা আমার সঙ্গে আমার বয়েসী হয়ে ভোরবেলা লেকের শিশিরভেজা ঘাসে ছুটেছেন। "রূপ্‌সি, এই ত্থাখো, আমি কেমন ছুটতে পারি।" "আমিও পারি।" "দেখি কে ফার্স্ট হয়।" "মা, মা, তুমিও এসো।" আমার মায়ের হাত ধরে আমি তাঁকেও ছুটিয়েছি। কত গল্প বলেছেন রাহুলবাবা। গ্যালিভারস ট্র্যাভেলের সেই বেঁটে বামুন মানুষের দেশে হারিয়ে গিয়ে আমি কেঁদে ফেলেছি। রাহুলবাবা গল্প বলার এমন কায়দাই জানেন। ওঁর গলার স্বর কখনো উঠে যায়, কখনো নামে। ওঁর মুখের ভঙ্গি, ভাষা, চোখের কটাক্ষ আমার চেনা জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে কখন যেন অচেনা জগতে পাড়ি দেয়।

সেই আমার অনেক কাছের প্রিয় রাহুলবাবা বড় অপ্রিয় চোখে দেখলেন আমায়। রাহুলবাবার বন্ধু বললেন, "রূপ্‌সি যে। কোথায় চললে?" আমি মুচকি হাসি। কিছু বলার আগেই রাহুলবাবা বলেন, "ওর কি যাবার জায়গার অভাব? বন্ধু-বান্ধব........ওর একটা আলাদা জগৎ আছে।"

কথাগুলো তো ঠিকই। কিন্তু আমার মনে হয়, ওঁর গলায় যেন

ব্যঙ্গ মিশে থাকে। আমার মোহভঙ্গ হয়। ছোটবেলার সেই রাহুলবাবাকে আমি এখন গোগ্রাসে গিলি। ওঁর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ভদ্রতার হাসি হাসি আমি। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি রাহুলবাবা তির্যক চোখে দেখছেন আমায়।

আমি আর কোন কথা বলি না। রাহুলবাবার বন্ধু বলেন, "তোমার এবার কোন্ ইয়ার হল?" "পার্ট টু দেব।" "বাহ্. তারপরই তো গ্র্যাজুয়েট? তুমি সত্যিই বড় হয়ে গেলে, রূপ্‌সি!" উনি হাসতে থাকেন। রাহুলবাবা বলেন, "তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। বেশী দেরী করো না।" আমি অবাক হই। এমনি তো উনি কথাই বলেন না। এখন হঠাৎ লোকদেখানো কথা বলা? আমার চোখ হাসে। সে চোখের ভাষা ধরা পড়ে রাহুলবাবার কাছে। ওঁর চোয়াল কঠিন হয়ে ওঠে। আমি জানি, এর জন্যে আমার মাকে কথা শুনতে হবে। হোক্ গে। "আচ্ছা চলি" বলে আমি আর একটুও না দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করি।

লাইটপোষ্টের আলোগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। আজকাল সাতটায় সন্ধ্যে হয়। দিন বড় হয়েছে বুঝতে পারি। আমাদের কাঁসারীপাড়ার এই গলিতে এখনো প্রায় বাড়িতেই সন্ধ্যেবেলা শাঁখ বাজে। ঠাকুরঘরে সন্ধ্যেপ্রদীপ জ্বলে। সাবেককালের বড় বড় বাড়ীগুলোর চাল্‌সে ধরা দেওয়ালের দিকে তাকালে মনে হয় এদের অনেক বয়স হয়েছে। রাস্তার মোড়ের ওই মুদিখানার বুড়ো লালাজী অনেক কালের পুরনো লোক। পানের দোকানের মনোহর যার একটা চোখে ছানি পড়ে গেছে, সে বলে ভবানীপুরের রাস্তায় সে নাকি ঘোড়ায় টানা ট্রাম দেখেছে। এসব গল্প আমি হাঁ করে শুনি। যখন মনোহরের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমি পান খাই। মাঝে মাঝে মিষ্টিপানের নেশা হয়। আমার ব্যাগে সব সময় বড় এলাচ থাকে। আমি এলাচ চিবোই। এখন আমি ব্যাগ খুলে এলাচ চিবোতে যাব, হঠাৎ চোখ

পড়ে তেলেভাজার দোকানের দিকে। গরম পেঁয়াজী ভাজছে লোকটা। আমার খুব লোভ হয়। এই ভাই, গোটা ছয়েক পেঁয়াজী দাও তো?” ফুটপাথের পেঁয়াজীর দোকানটার সামনে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি।

শালপাতার ঠোঙায় গরম ছটা পেঁয়াজী হাতে নিয়ে আমি তারিয়ে তারিয়ে একটু একটু করে খাই। গরমে আমার জিভ পুড়ে যায়। আমি মনে মনে পেঁয়াজীওলাকে গালাগালি দিই।

হেঁটে ট্রাম লাইনের দিকে চলে যাই। খুব বেশীদূর নয়। কাছেই দেশপ্রিয় পার্কে সুতৃপ্তিতে আমাদের আড্ডা হয়। ট্রামে উঠলে কুড়ি পয়সা ভাড়া। যদিও আজকাল আর ট্রাম চলে না এ রাস্তায়। পাতাল রেলের জন্যে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে একদিকে খাদ আর অন্যদিকে মাটির স্তূপ বানিয়ে রেখেছে। ট্রামের রুট তাই ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি জগুবাবুর বাজারের সামনের স্টপে দাঁড়াই। যদি ঢাকুরিয়ার মিনিবাস অথবা অন্য কোন বাসে উঠতে পারি।

আর একটু বাদেই রূপেনের সঙ্গে আমার দেখা হবে ভেবে আমার হৃৎপিণ্ডটা লাফায়। বুঝতে পারিনে এত উত্তেজনা আমার আসে কোত্থেকে? বাস-গুমটির টেলিফোনের বুথে দাঁড়িয়ে রূপেনকে কাল যখন আমি ফোন করি, তখন ভাবিনি হঠাৎ একদিনের মধ্যেই রূপেন আমার কাছে এত দামী হয়ে উঠবে। আমার মনটা গুনগুনিয়ে ওঠে। আমি এক লাইন গেয়ে উঠি, ‘‘হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে।” আর কোন লাইন আমি গাই না। ওই এক লাইনই বারবার বড় তৃপ্তিভরে গেয়ে যাই।

অফিসফেরত যাত্রীর ভিড়। সিনেমা ভাঙ্গা যাত্রীর ভিড়। বাসের পাদানীতে পা রাখার জায়গা হয় না। “দূর ছাই।” বিরক্তভাবে আমি একটা খালি ট্যাক্সির দিকে হাত বাড়াই।

গতকাল মাইনে পেয়েছি। কড়কড়ে দু’খানা পঞ্চাশ টাকার নোট। দু’-দুটো টিউশনির টাকা। কতই বা উঠবে সুতৃপ্তি পর্যন্ত? টাকা তো খরচের জন্যেই।

হু হু করে বাতাস আসে ট্যাক্সির খোলা জানলা দিয়ে। আরামে আমি চোখ বুজি।

মাকে বলিনি এখনো, টিউশনির টাকা পেয়েছি। বললেই তো বলবেন, "পঞ্চাশ টাকা রেকারিঙ-এ ফেল।" ইউনাইটেড ব্যাংকে আমার নামে একটা রেকারিঙ ডিপোজিট খুলিয়েছেন মা আমায় দিয়ে। মাইনে পেলেই পঞ্চাশ টাকা করে জমিয়ে ফেলতে হয়। আমি অবশ্য সব মাসে টাকাটা জমা দিই না। মাঝে মাঝে দিই।

"হ্যাঁরে, টাকা জমা দিয়েছিস?"

মা জিজ্ঞেস করলে আমি মাথাটা নেড়ে দিই। যার অর্থ হ'ল, হ্যাঁ।

মাঝে মাঝে পাশবই চেক করেন মা। তখন মাকে আমার পাকা গোয়েন্দার মত মনে হয়। ধরা পড়ে যাই। মা চেঁচিয়ে ওঠেন। "কি করলে অতগুলো টাকা?"

"খরচ হয়ে গেছে।"

রেগে গিয়ে মা তখন কাঁদতে থাকেন। "এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই, তোকে নিয়ে আমি কি করবো, রূপ্সি?" কাঁদতে কাঁদতে মা বলেন, "আমি কি আমার জন্যে টাকা রাখতে বলি তোকে? তোর ভালোর জন্য না আমি........?"

"থাক, থাক, আমার ভালোয় তোমার কাজ নেই।" আমি চাপা রাগে ফেটে পড়ি।

আমার উদ্ধত ভঙ্গি মাকে ছুঁয়ে যায়। "যেমন বাবা, তার তেমনি মেয়ে। ওর বাপটাও এমনি জ্বালাত আমায়।" মা বিড় বিড় করেন।

তখন আমার খুব দুঃখ হয়। আমার বাবার জন্যে মা তো অনেক কষ্ট পেয়েছেন, আবার আমার জন্যেও পান, তা আমি সত্যিই চাই নে। আমি মায়ের পা ধরে বলি, "আর কখনো তোমার মুখে মুখে কথা বলব না মা।"

মা আমার চোখে চোখ রেখে কি যেন খোঁজেন। আমার বাবাকে কি? জানি নে।

তবু আমার স্বভাব আমায় প্রতারণা করে। প্রায় মাসেই এমন ঘটনা ঘটে যায়।

মায়ের অনেক কষ্টে জমানো পয়সা ফেলা মাটির ঘট ভেঙ্গে আমায় গুণে গুণে পঞ্চাশ টাকা বার করে দেন, "যাও ব্যাঙ্কে ফেলে এসো।"

আমি জানি, আমার বিয়ের জন্যে ওই টাকাটা জমিয়ে দিচ্ছেন মা। পাঁচ বছর পর নাকি অনেকগুলো টাকা পাব আমি। কিন্তু পাঁচ বছরের আগেই তো বিয়ে হয়ে যাবে আমার? এ সব কথা আমি ভাবি। মাকে জিজ্ঞেস করা হয় না।

সুতৃপ্তির সামনেই বাসস্টপে আমি রূপেনকে খুঁজি। এখানেই ওর দাঁড়ানোর কথা ছিল। আমায় হতাশ হতে হয়। ও আসেনি। পাক্কা পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেও রূপেনের পাত্তা পাওয়া যায় না। আমার আবার এই দাঁড়িয়ে থাকার ধৈর্যটা বড় কম। তবু কি আর করা যায়? রাস্তায় চলমান লোকের কালো কালো মাথা আর ট্রাম বাস গুণতে গুণতে আমি সময় ফুরিয়ে ফেলি। আধ-ঘণ্টা হ'ল দাঁড়িয়ে আছি। পেছন থেকে আমার চুলে টান পড়ে।

"কে?"

আমি চমকে উঠি। পেছনে ফিরে দেখি, দীপঙ্কর, অতনু, শ্রীময়ী।

"তোরা?" আমি বলি।

শ্রীময়ী বলে, "দীপঙ্করের বাড়ি গিয়ে দেখি অতনু এসেছে। আড্ডার লোভে আমরা পালিয়ে এলাম এখানে।"

"কিন্তু তুই?"

দীপঙ্করের চোখ হেসে ওঠে। "কারণটা বোধহয় সবারই এক।"

কথা বলতে বলতে আমরা চায়ের দোকানে ঢুকি। পেছন ফিরে ফিরে গরুর মত সতৃষ্ণ নয়নে আমি রূপেনকে খুঁজি। শুধু একজনের অভাব আমায় এমন করে পোড়ায় কেন?

চেয়ারটা টেনে নিয়ে আমার প্রায় গা ঘেঁষেই বসে দীপঙ্কর। "চা

খাবি তো ? নাকি কফি ?"

আমি ভুরু কুঁচকে তাকাই, "হঠাৎ এতো আদরের ঘটা ?"

দীপঙ্কর বলে, "তোকে কোন্‌দিন আদর করে চা-ফা না খাওয়াই ?"

টেবিলের তলা দিয়ে দীপঙ্কর আলগোছে চালান করে দেয় আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা শ্রীময়ীর কাছে। আমি টের পেয়ে বলি, "কি হচ্ছে ?"

হাসিমুখে নাচাতে থাকে শ্রীময়ী আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা। "কি ব্যাপার রূপসী ? তোর ব্যাগটা এতো ভারী ?"

ওর হাত থেকে ওটা কেড়ে নেয় দীপঙ্কর। বলে, "টাকার গরমে মাইরি গরম হয়ে আছে ! এই কাটলেটের অর্ডার দে।"

আমি ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে কেড়ে নিই ব্যাগটা। বলি, "আব্দার।"

দীপঙ্কর হাসে, "খুব কেপ্পন হয়েছিস তো ? আমার পকেট কেটে খাবার সময় মনে থাকে না ?"

"বাজে বদনাম দিস্‌নি। জিভ খসে যাবে বলছি।" আমি হাসতে থাকি।

গোবেচারা মুখ করে অতনু দেখতে থাকে আমায়। আমি আড়চোখে একবার দেখি ওকে। ওকি সত্যিই আমার প্রেমে পড়েছে ? নাকি প্রেমিকের মতো চোখ করে দেখছে ? ওর এই চোখ, এই চাউনি আমার ভাল লাগে না। আগের সেই সহজ অতনুর কথা আমি একমুহূর্ত ভাবি। সেদিন আমাদের বাড়ি থেকে চলে আসার পর অতনুর সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখা হ'ল। সেই অপ্রীতিকর দৃশ্য মনে পড়ে আমার। আমি ওকে চলে যেতে বলেছিলুম, তবু ও বসেছিল। আমি ওকে একা ফেলে রেখে উঠে গিয়েছিলুম। এটা ভদ্রতা কি অভদ্রতা সে-সব চিন্তা করার মত মানসিকতা আমার ছিল না। অতনু দুঃখ পেয়েছে। ওকে দুঃখ দেবার ইচ্ছে আমার নেই। ওকে সুখ দেবার জন্যে কোন অভিনয় তো আমি করতে পারব না।

"অতনু যে এতো চুপচাপ ?" আমি বলি।

অতনু যেন একটু চমকে ওঠে।

শ্রীময়ী বলে, "কি জানি ওকে বোধহয় কেউ তুক্ করেছে।"

ওর কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠি। অতনুও হাসে।

শ্রীময়ী বলে, "হ্যাঁ, সত্যি ও ক'দিন থেকে মুখ গোমড়া করে রয়েছে। সেদিন আমাদের বাড়ি গিয়ে ও অমনি গোমড়া মুখে বসে রইল।"

"নাট্যকারের মুডের ব্যাপার।" আমি বলি।

"অতনু, তোমার পাড়ার নাটকের রিহার্সাল কেমন চলছে?"

ও কোন জবাব দেয় না।

দীপঙ্কর হেসে বলে, "ঠিকই, ওকে কেউ তুক্ করেছে।"

"ইস। আমায় যদি কেউ তুক করত।"

আমি চোখ পাকিয়ে বলি, "তোর মত মুখরাকে!"

শ্রীময়ী বলে, "যা বলেছিস।"

চা এসে যায়। তিন কাপ চা। দীপঙ্কর বলে, "আরে এককাপ কম হয়েছে তো। আমরা চারজন।"

শ্রীময়ী বলে, "কোই বাত নেহি হ্যায়, এই ভাই"—ও রেষ্টুরেণ্টের বেয়ারাকে ডেকে বলে, "আর একটা কাপ দাও তো।"

খালি কাপ সামনে আসতেই শ্রীময়ী ওর নিজের কাপ থেকে চা ঢালতে যায়। আমিও আমার কাপ থেকে খানিকটা চা ঢেলে দিই।

দীপঙ্কর বলে, "আমি ভাই ভদ্রতা জানি না।"

ও ওর নিজের কাপে গোঁফ ভিজিয়ে হুপ্ করে একটা চুমুক মারে।

অতনুর কাপটা শ্রীময়ী ওকে এগিয়ে দেয়, "অতনু নাও।"

অতনু ওর হাতের আংটিপরা আঙুলটা নেড়ে বলে, "এই না, আর চা নয়। সকাল থেকে অনেক কাপ হয়েছে।"

"এতক্ষণ কোন্ ভাবরাজ্যে ছিলি যে বলতে পারিস নি?"

দীপঙ্কর ওর পিঠে একটা চড় মারে। বলে, "এই শ্রীময়ী, বাড়তি যদি তোদের হয়ে থাকে তো আমায় দে।"

"তুই খুব চায়ের হ্যাংলা আছিস্ বাপু।" শ্রীময়ী ওকে মুখ ঘুরিয়ে বলে।

আমি অন্যমনস্কভাবে কাপে চামচে নাড়ি। আমার মন চলে যায় রূপেনের কাছে। আমায় আসবে বলে ও কেন এলো না আজ? ওর বাড়ির নম্বরটা আমার মুখস্থ। ও বেহালার রায়বাহাদুর রোডে থাকে। আমি ঘড়ি দেখি। এখন কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যে ছ'টা। রাসবিহারীর মোড় থেকে যদি চৌদ্দ নম্বর বাসে উঠি। সাতটার মধ্যে যদি পৌঁছই····।

কোন্ মানুষ যে কার কাছে কখন দুর্লভ হয়ে ওঠে! রূপেনের সঙ্গে দেখা না হলে যে এমন মন কেমন করবে এ কথা কি ছাই কালও বুঝেছিলাম?

দীপঙ্কর বলে, "এই কাল সকালে তোরা সব আসছিস্ তো?"

শ্রীময়ী বলে, "না, ভাই, রোববার সকালটা আমি এখানে মাটি করতে রাজি নই।"

"কেন?" দীপঙ্কর জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

শ্রীময়ী বলে, রোববার সকালে কবি, লেখকদের আড্ডায় ভিড়ে···?"

"তো কি হয়েছে?" দীপঙ্কর ফের তাকায়।

শ্রীময়ী বলে, "আমি এসে ছন্দপতন ঘটিয়ে অভিশাপ কুড়বো?"

"তুই স্রেফ ফুল!" দীপঙ্কর হাসে। "কিস্যু হবে না তোর। স্মৃতৃপ্তির রোববার সকাল কি শুধু কবি, লেখকদের জন্যে বুক্ড? আমরা একটু আগে এসে একটা কোণ বেছে গেড়ে বসব।"

"কিরে তুই আসছিস্ নাকি?" শ্রীময়ী আমায় বলে।

"আমি?" আমি মাথা দুলিয়ে বলি, "দেখি। আমার তো এলে ভালই লাগে। অনেককে দেখা যায়। অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়।"

দূর থেকে গলা বাড়িয়ে অতনু বলে, "একজাক্টলি।" দীপঙ্কর চেঁচায়, "তোর অটোগ্রাফ খাতায় এখন ক' নম্বর চলছে রে অতনু? ইস্। কি ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ।" দীপঙ্কর বলে, "মাঝে মাঝে

ভাবি; আমরাই শুধু বেরসিক। এই বাংলাদেশের কবি, লেখকদের ভিড়ে জন্মে এক লাইন পদ্য লিখলাম না।"

শ্রীময়ী বলে, "অতনুকে আর আমাদের দলে টানিস না। ওর আবার নাটকের দল আছে। খদ্দরের পাঞ্জাবী পরে ভারিক্কি চালে হাঁটে।"

অতনু হাসে। "আবার আমায় নিয়ে পড়লি কেন তোরা?"

"আরে ভাই, তুমি আমাদের গ্ল্যামার।" শ্রীময়ী হাসতে হাসতে বলে। লজ্জার কথা বল? গল্প, গদ্য, নাটক কিস্সু লিখতে জানি না।

দীপঙ্কর টেবিল চাপড়ায়, "থাম, থাম, অনেক বুক্নি ঝেড়েছিস। ওসব কাব্যিক প্যানপ্যানানির মধ্যে না যাওয়াই ভাল। তার চেয়ে চল ম্যাটিনী শো মেরে দিই, 'দৌড়'। ভাল হয়েছে নাকি শুনলাম।"

অতনু বলে, "এই দৌড় থেকেই দৌড়ে চলল দৌড়ের লেখক।"

হেসে আমরা গড়িয়ে পড়ি।

দীপঙ্কর বলে, "সমরেশ মজুমদার এখন ভাল লিখছে।"

শ্রীময়ী বলে "আর একখানা বই শিগ্‌গিরই রিলিজ করছে। শুনেছি ভাল হয়েছে।"

"কি বই?"

আমরা তাকাই। শ্রীময়ী বলে, "বিমল করের লেখা পরিচয়। আমার পিসির বন্ধু পার্বতী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রডিউসার।"

আমি বলি, "তবে তো দেখতেই হয়। তোর পিসির বন্ধু যখন প্রডিউসার।"

শ্রীময়ী বলে, "প্রত্যেকেই সুন্দর অভিনয় করেছে শুনেছি।"

আর বেশী দেরী করা চলে না। রূপেনের বাড়ি যেতে হলে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হয়। আমি উঠে পড়ি। ঠিক সেই সময়ে দীপঙ্কর বলে, "রূপেনটা আসবে বলেছিল। ডুব মারল।"

"কি হয়েছে রূপেনের?"

আমি চোখের কোণে হেসে বলি।

চেয়ারের গায়ে একটা ঘুষি মেরে দীপঙ্কর বলে, "কে জানে! লেকে সাঁতার কাটে। বোধহয় জ্বরটর বাধিয়েছে। কাল দেখা হয়েছিল, বলল শীররটা ভাল নেই।"

"রূপ্‌সি এতো তাড়াতাড়ি কাটছিস যে?" শ্রীময়ী আমার শাড়ীর আঁচল চেপে ধরে।

"আমার ভাই একটু তাড়া আছে।"

অতনু বলে, "আমিও উঠব। তুমি কোন্‌দিকে যাবে রূপ্‌সি?"

"জ্বালাতন! তুমি আবার আমার সঙ্গে কেন?" আমার বলার ধরনে ওরা হেসে ফেলে। শুধু অতনু হাসতে পারে না।

আমি সুতৃপ্তি থেকে বেরিয়ে রাসবিহারীর মোড়ের দিকে এগোই। আমার পেছন পেছন অতনুও আসে। আমার এবার সত্যি রাগ হয়। আমি ওকে দেখেও না দেখার ভান করি। আমরা দশ মিনিট চুপচাপ দু'জনে হেঁটে যাই। রাসবিহারীর মোড়ের কাছে এসে আমি ঘুরে দাঁড়াই। অতনুও দাঁড়িয়ে যায়। "তুমি কোথায় যাবে অতনু?"

অতনু থতমত খায়। বলে, "তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।"

"যদি বলি, তোমার কথা শোনার সময় আমার নেই?"

অতনু বেহায়ার মত তবু বলে, "খুব কি অসুবিধে হবে? যদি মিনিট পনেরো সময়·······।"

"না, না, নেই।" আমি অধৈর্যের মত বলি।

"তুমি শুধু শুধু রাগ করছ।" আহত হয় অতনু। কিন্তু ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় আমার সত্যি নেই। আমি অতনুকে ফেলে রেখে দ্রুত রাস্তা পেরোই।

ভিড়ের মধ্যে মিশে যায় অতনু। চোদ্দ নম্বর বাসের ঠাসা মানুষের গাদার মধ্যেও আমি *ঠেলেঠুলে* কোনরকমে নিজের জন্য একটু জায়গা করে নেই।

অনেক মানুষের মাথার ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি রাস্তা দেখি,

রাস্তায় চলমান মানুষ, রিক্সা, গাড়ী, ট্রাম। হু হু করে বাস ছুটে যায়।

ভবানী সিনেমার সামনে একজনকে চোখে পড়ে যায় আচমকা। মুখটা আমার চেনা লাগে। গায়ে হলদে রঙের বুশসার্ট। পরনের প্যান্ট কি রঙের খেয়াল নেই। বাবরি চুল। চোখে কোন চশমা-টশমা নেই। দাড়ি, গোঁফ কামানো। শ্যামবর্ণ। ছিপছিপে মাঝারি গড়ন। আমাদের বাসের হেড লাইটের আলোয় মুহূর্তে ওঠা মানুষটাকে দেখে মনে হয় উনি আমার বাবা না? দূর, তা কি করে হয়? শুনেছি। আমার বাবা তো বেনারসের ওদিকে কোথায় থাকেন।

আমি কি বোকা! উনি তো কলকাতায় আসতেও পারেন। আমার বুকের মধ্যে লাফাতে থাকে। বুঝতে পারি না কেন? অনেকের পা মাড়িয়ে আমি জানলায় নিজের মাথা গলিয়ে দিই। যদি আর একবার দেখা যায় তাঁকে। বাসটা তখন অনেক দূর ছুটে এসেছে। বুকের মধ্যে টন্ টন্ করে। কি যেন একটা ব্যথা। আমি কি আর একবার দেখতে পাব না আমার বাবাকে?

নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হই। ওঁর জন্যে আমার এত ব্যাকুলতা কেন? ওই মানুষটার সঙ্গে আমার কতটুকু পরিচয়? ছেলে-বেলায় ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। আজ নেই। আজ উনি আমার কাছে অতীতের একজন পরিচিত মানুষ মাত্র। যে মানুষটার জন্যে আমার জীবন ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। আমার মনের ওপর দিয়ে বহু ঝড় বয়ে চলেছে। যে মানুষটা কোন কর্তব্যই করেন নি তাঁর সন্তানের ওপর, তার জন্য যদি কোন টান সত্যিই থেকে থাকে, তবে তা দুর্বলতা। আমি মনকে বোঝাই।

রূপেনদের বাড়ি খুঁজতে খুব বেশী অসুবিধে হয় না। রূপেনের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। বড় রাস্তার ওপরে একটা পানের দোকান। তার পাশ দিয়ে সরু একটা গলি চলে গেছে। গলিতে

ঢুকেই প্রথম বাঁ হাতের বাড়িটা। পানের দোকানে গিয়ে ওর নাম করলেও নাকি বলে দেবে। আমার অবশ্য তার দরকার হয় না।

সাদাসিধে নতুন বাড়ি। একতলা। বাড়ির পাশে ফাঁকা একটু জায়গা। সেখানে গোটা দুয়েক নারকেল গাছ। একটা আম গাছ। ভবানীপুরের চাপা ভিড়ে থেকে আমি হাঁফিয়ে উঠি। এই গাছ-গাছালির হাওয়া আমার বেশ লাগে। রূপেনের বাবা বোধহয় কোন এক সরকারী অফিসে কাজ করেন। ধার দেনা করে এই বাড়ি করেছেন। রূপেন কথায় কথায় বলছিল একদিন। সেই ধার শোধ করার খানিকটা দায়িত্ব পড়েছে রূপেনের ওপর।

আমি দরজার কড়া নাড়ি। কোন সাড়া নেই। সামনের ঘরটা অন্ধকার। জানলা খোলা। আমি জানলার গ্রীল ধরে ভেতরে উঁকি মারি। কাউকে দেখতে পাই না। আবার কড়া নাড়ি। ঝন্ ঝন্ ঝন্। ক্রমাগত কড়া নেড়ে চলি। সাইকেল রিক্সয় করে কে যেন আসে। আমার সামনে এসে দাঁড়ায় রিক্সটা। মোটা সোটা কালোমত এক ভদ্রলোক। মধ্যবয়স্ক। তাঁর হাতে বাজারের ব্যাগ। বোধ-হয় রূপেনের বাবা। "কাকে চাই ?" আমায় জিজ্ঞেস করেন উনি। "রূপেন আছে ?" আমি বলি। "রূপেনকে এ সময় বাড়িতে পাওয়া যায় না।" রাশভারী গলায় উত্তর দেন ভদ্রলোক। "ও, আচ্ছা, ঠিক আছে।" ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াই। "শোনো !" ওঁর ডাকে আমি ফিরে তাকাই। "তুমি কে তা তো বললে না ?" সকৌতুকে তাকান উনি। "আমি ?" মুচকি হেসে বলি, "রূপেনের বন্ধু"। "একসঙ্গে পড় বুঝি ?" "হ্যাঁ।" "তো ফিরে যাচ্ছ যে ? ভেতরে চল, বোসো।" আমি আমতা আমতা করি। "ওর বোধহয় ফিরতে দেরী হবে।" "ওর অপেক্ষায় বসতে বলছি না। আমরাও তো আছি। মানে আমি, ওর মা।" আমি হাসি। কিছু বলি না।

রিক্স থেকে নেমে রূপেনের বাবা পকেট থেকে পয়সা বার করেন। ল্যাম্পপোষ্ট থেকে ছিটকে আসা সামান্য আলোয় উনি হাতের তেলোতে

রাখা পয়সাগুলো ঝুঁকে দেখেন। গুণে গুণে কতকগুলো পয়সা দেন রিক্সওলাকে। আমার দিকে ফিরে তাকান। বলেন, "চোখে ভাল দেখতে পাই না। মাইনাস্ ফাইভ চলছে। তবু পাওয়ার বেড়েছে মনে হচ্ছে কদিন থেকে।" আমি বলি, "চোখ দেখান না কেন ?" "দেখাব দেখাব করি, সময় হয় না।" দু হাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে উনি এগিয়ে আসেন দরজার দিকে। ওঁর কাঁধটা সামান্য নুয়ে পড়ে। আমার কেমন মায়া হয়। "দিন না আমায় একটা ব্যাগ ?" উনি খুশি হন, বলেন, "নেবে ? নাও।" এই অর্ধবৃদ্ধ মানুষটির একটি বোঝা কমিয়ে দিলে........হা হা........উনি হাসতে থাকেন। আমার ভাল লাগে।

"এস মা, আমাদের খিড়কীর দরজা দিয়ে যেতে হবে। রূপেনের মা অসুস্থ। দরজা খুলতে পারবেন না।" "তাই বুঝি ? আমি অনেকক্ষণ ধরে কড়া নেড়ে সাড়া পাইনি। ভাবলাম, কি ব্যাপার ?" "ওর মা একেবারে শয্যাশায়ী।" কথা বলতে বলতে ছোট্ট বাগানটা পেরিয়ে খিড়কীর দরজা খোলেন উনি। দরজাটা ভেজানো ছিল। উনি ধাক্কা দিতেই খুলে গেল।

প্রথমে একফালি বারান্দা। তারপর ঘর। ঘরের মধ্যে ঘর। পর পর দুটো ঘর পেরিয়ে তৃতীয় ঘরে গিয়ে থামলেন রূপেনের বাবা। আমিও এতক্ষণ ওঁকে অনুসরণ করছিলাম। এইবার দাঁড়িয়ে পড়ি। হাল্‌কা নীল আলো জ্বলছে। রূপেনের মা শুয়ে আছেন তক্তপোষের ওপরে। ঘুমিয়েই আছেন মনে হয়। বাজারের ব্যাগটা দরজার পাশে রেখে একটা বেতের চেয়ার টেনে মেসোমশাই বলেন, "বোসো।"

আমি বসি। উনি স্ত্রীর কপালে আলগোছে হাত বুলিয়ে বলেন, "ওগো, শুনছো ? তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?"

স্নেহমমতা ঝরে পড়ে ওঁর গলার স্বরে। নিজের বাবাকে আমার মনে পড়ে। মায়ের কপালে কি কোনদিন আমার বাবা হাত

রেখেছিলেন অমনি করে? জানি না। খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে বাবার স্মৃতি।

চোখ মেলে তাকান রূপেনের মা। "কি হ'ল?"

"বাজার নিয়ে এলাম। তুমি যা যা বলে দিয়েছিলে একেবারে ফর্দ মিলিয়ে।"

হুঁ কনুইতে ভর রেখে মাসিমা উঠতে চেষ্টা করেন। পারেন না। "উহুহু"........উনি যন্ত্রণায় কাতরে ওঠেন। মুখখানা বিকৃত হয়ে যায়।

"কি হ'ল? ব্যাথা পেলে?" রূপেনের বাবার গলা কেঁপে যায়।

আমিও চেয়ার ফেলে এগিয়ে যাই।

"ও কে?" মাসিমা অবাক হয়ে দেখেন আমায়।

ঠোঁট ভেঙ্গে হাসি আমি। উত্তরটা মেসোমশাইই দেন, "সন্তুর বন্ধু।"

"সন্তু? রূপেনের নাম সন্তু?" আমি এই প্রথম শুনি ওর ডাকনামটা। "তোমার নাম কি? তোমার নাম কি শ্রীময়ী?"

"না না। আমি রূপ্‌সি।"

"হ্যাঁ, রূপ্‌সির নামও তো শুনেছি মনে হয়।"

মনে হয়? আমার বুকের মধ্যে পিন্ ফোটে। রূপেনের কাছে কি আমার চেয়েও শ্রীময়ীর দাম বেশী? আর সেই রূপেনের জন্যে আমি কেন পাগল? হৃদয়ের ভাষা বড় অদ্ভুত। একের ভাষার সঙ্গে অন্যের ভাষা মেলে না।

"শ্রীময়ী একদিন এসেছিল। আমি সেদিন ছিলাম না। আমার বড় জামাই আমায় নিয়ে গেছিল পি জিতে কার্ডিওগ্রাফ করাতে। ফিরে এসে শুনলাম সে এসেছিল।"

উনি এতো শ্রীময়ী শ্রীময়ী করছেন কেন? আমার রাগই হয়। ওঁর চেয়েও রূপেনের ওপরে। "আমি আজ চলি।"

"ওমা সেকি! বোসো, বোসো, এই তো এলে।" রূপেনের মা বলেন।

"তুমি কোথায় থাকো ?" মেসোমশাই প্রশ্ন করেন।

"ভবানীপুরে।"

"ভবানীপুরের কোথায় ?"

"কাঁসারীপাড়া।"

"বাবা কি করেন ?"

"চাকরি।"

"মানে কোথায় ?" মেসোমশাই খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেন।

আমি বিব্রতবোধ করি। আমার বাবা কোন অফিসে চাকরী করেন আমি তো জানি না। আমি আস্তে করে জিভ নাড়ি। বলি, "বেনারসে।"

"ও তোমার বাবা তাহলে এখানে থাকেন না ?"

আমি কথাটা এড়িয়ে যাই। বলি, "আপনার কি হয়েছে মাসিমা ?"

"আর্থারাইটিস।" উনি কেটে কেটে কথাটা উচ্চারণ করেন।

আমি শিউরে উঠি।

ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মেসোমশাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "বড় ডাক্তার দেখছেন। তোমায় মাসিমা শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবেন।"

"ওসব তোমার সান্ত্বনা।" মাসিমা হতাশভাবে বলেন।

খাটের তলা থেকে একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। আমি অন্যমনস্ক-ভাবে চেয়ারের গায়ে তিনবার টোকা দিই।

"একটু চা খাবে মা ?" স্তব্ধতা ভাঙেন মেসোমশাই। উনি মাসি-মার দিকে তাকান, "হাঁ গো, সুবলা কোথায় ?"

মাসিমা বলেন, "ছাখো, সে বোধহয় ছাদে।"

"সুবলা সুবলা" মেসোমশাই জোরে হাঁক পাড়েন।

আমি তাড়াতাড়ি, বাধা দিয়ে বলি, "আজ থাক, আর একদিন এসে না হয় খাবো।"

"না না, বোসো বোসো।" দু হাত তুলে আমায় বসিয়ে দেন

মাসিমা ফ্যালফ্যাল করে তাকান। "আমি অক্ষম, কিছুই করার ক্ষমতা নেই।"

মেসোমশাই ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফের বলেন, "কে বলেছে তুমি অক্ষম? তুমি শিগ্গিরই সক্ষম হবে। এত বড় বড় ডাক্তার দেখছেন।"

"আহ থামো! গরম জলের ব্যাগটা দাও আমায়।"

মেসোমশাই তড়িঘড়ি ছুটে যান রান্নাঘরে।

"আপনার কোথায় কষ্ট মাসিমা?" আমি এগিয়ে যাই ওঁর কাছে।

উনি নরম চোখে আমায় দেখেন। "কষ্ট তো সারা শরীরে মা। পা দুটোই একেবারে অসাড়।"

"কবে থেকে এ রকম হ'ল?"

"বছর দুয়েক।"

আমি অবাক হই। এত গল্প করেছে রূপেন আর এই খবরটা দেয়নি আমায়।

তিন কাপ চা একটা কলাইকরা বড় থালাতে বসিয়ে একজন বেঁটে মেয়েমানুষ ঘরে ঢোকে। ওর বয়স বছর চল্লিশেক হবে। স্থূল দেহ, প্রকাণ্ড মাথা, চ্যাপ্টা নাক, পুঁথির মত গোল গোল চোখ, গায়ের রঙ কালো। বেঁটে বেঁটে পা দুটো নিয়ে সে তর্তর্ করে ছুটে আসে। আমার হাসি পায় ওকে দেখে। ও আমার হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে বলে, "দাদাবাবুর বন্ধু? এ্যাঁ?" একগাল হাসি হাসে।

ওর হাঁ বিরাট বড়। সেই মুখগহ্বরে জিভ নেড়ে নেড়ে ও অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলে, "মেয়ে বন্ধু! হি হি হি········"

মাসিমা ধমকে ওঠেন। "কোথায় ছিলে এতক্ষণ? ডেকে ডেকে পাওয়া যায় না। বাবু বাজার এনে রেখেছে। মাছটা পচে যাবে। যাও কেটে ফেল তাড়াতাড়ি।"

যাও কেটে ফেল তাড়াতাড়ি।"

ও চেঁচিয়ে ওঠে, "মুখ করবেনি মা। বলতেছিই। আমার বিচ্ছাম লাগে না?"

মেসোমশাই কড়া ধমক লাগান, "যাও, আর চেঁচামেচি করো না। কাজ করো গিয়ে।"

বেশ লাগছে আমার রূপেনদের বাড়ি। আমার মনে হচ্ছে, এটা যদি আমার বাড়ি হত? কেমন যেন লাগে ভাবতে। রূপেনের মা, আমার মা, রূপেনের বাবা, আমার····ওদের চেয়ে আমার মায়ের বাড়ি অনেক বেশি সাজানো! সচ্ছলতা অনেক বেশি। তবু কি যেন একটা আছে ওদের বাড়ি, যা আমার মায়ের বাড়ি নেই। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি চারদিক। দেওয়ালে দেওয়ালে সিমেণ্টের তাক। তার ওপরে প্রচুর বই। আমি বলি, "আপনাদের বাড়িতে তো অনেক বই। আমার লোভ হচ্ছে পড়ার।"

মাসিমা হাসেন। বলেন, "মধ্যে মধ্যে এখানে এসে পড়বে।"

মেসোমশাই বলেন, "তোমার মাসিমা তো একা থাকেন, তাঁরও ভাল লাগবে। তবে বই বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে না মা।"

আমি একটু অবাক হয়ে তাকাই।

মেসোমশাই হাসেন, "শুনতে খুবই খারাপ লাগবে। তবু বলি, বঙ্গসন্তানরা বই ফেরত দেয় না। আমার প্রায় এক বুককেস্ ভরা বই সন্তুর বন্ধুরা নিয়ে ফাঁক করে দিয়েছে।"

মাসিমা অপ্রস্তুত হন। "কি যে বল, ওকে এসব কথা বলছ কেন তুমি?"

মেসোমশাই বলেন, "আরে বলছি এজন্যে, ও তো আর সে দলের নয়।"

আমি ঠোঁট টিপে হাসি। বলি, "কে বলল নয়?"

মেসোমশাই বলেন, "তোমার মুখ দেখেই আমি বলছি, তুমি খুব পড়ুয়া নও। ভাল পড়ুয়াদেরই বই-মারা বিদ্যে থাকে।" উনি মুচকি

হাসেন।

"আচ্ছা মেসোমশাই!" আমি বলি, "আপনার এই কালেক্শন·····।"

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উনি বলেন, "আমিও মেরেছি. আমার এই কালেকশনের অনেক বই-ই দেশের বাড়ির লাইব্রেরীর।"

আমি খিলখিল করে হেসে উঠি। মাসিমাও হাসেন। আমি বলি, "বই গায়েব করার ব্যাপারে শুধু বঙ্গসন্তানদের দোষারোপ করছেন কেন? বার্নাড শ'কে একজন বলেছিলেন "শ, তোমার এই বিরাট কালেকশন·······।"

মেসোমশাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন, এর অনেক বই-ই আমার কেনা নয়·······।" মেসোমশাই হাসতে থাকেন। বলেন, "বহু বড় বড় লেখক, কবিদের এই স্বভাব স্বদেশ-বিদেশ সব জায়গাতেই। তবে বই চুরির বিদ্যেতে কোন পাপ নেই।"

বাসস্টপ অবধি উনি এগিয়ে দিয়ে গেলেন। রাস্তায় আসতে আসতে বলছিলেন, "আমি ছাত্রজীবন থেকে সংগ্রহ করছি এসব বই যখন সময় পাই, তোমার মাসিমাকে পড়ে শোনাই। আমি ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে গিয়েও বসে থাকি মাঝে মাঝে। তোমার মাসিমা বেচারীর বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিনগুলো কেটে যায়। বড় একা বোধ করেন উনি। তোমরা এসে গল্প-টল্প করলেও ওঁর ভাল লাগবে। শ্রীময়ী তো আসে।"

আবার শ্রীময়ী! আমি বুকের মধ্যে ফের ধাক্কা খাই।

বাসের পা-দানিতে পা রেখেছি সবে। "রূপ্‌সি!" আমার আঁচলে টান পড়ে। ফিরে দেখি, রূপেন। বাস ছেড়ে দেয়। আমার বুকের রক্ত চল্‌কে ওঠে।

বেশ রাত হয়েছে। আমাদের পাড়ার সব দোকান প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু পানের দোকানের ঝাঁপটা এখনো আধখোলা অবস্থায়.

উঁকি মারছে। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে আমি একটা টানা রিক্সা নিয়েছি। •তাড়াতাড়ি ফিরব বলে। কিন্তু রিক্সাওলা যেভাবে ছুটছে তাতে মনে হয় না খুব শিগগিরই পৌঁছুব।

আমার সব চাওয়াগুলোই খুব দূরের, আমি যা চাই, তা কখনো সহজে পাই না। পরীক্ষায় ভাল ফল করতে হলে আমায় রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু শ্রীময়ী কেমন ফাঁকি মেরেই ঠিক টপ্‌কে বেরিয়ে যায়। শ্রীময়ীর ভাগ্য আমার চেয়ে বরাবর ভাল। আমি জানি, রূপেনের জন্যে আমার মনটা যত ব্যাকুলই হোক না কেন, শ্রীময়ীকে রূপেন আমার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসে। কিন্তু রূপেন, রূপেনের চোখ অন্য কথা বলে। রূপেন ওর চোখ দিয়ে আমায় অমন ক'রে ভালবাসে কেন? আমি তো জানি, আমি রূপেনকে পাব না। যদি পাই, তাহলে আমায় অনেক মূল্য দিতে হবে। বরং আমি অতনু, দীপঙ্কর ওদের অনেক সহজেই পেতে পারি। যা সহজ তাতে যে আমার কোনদিনই মন ভরে না। রূপেন তো একটা সাধারণ, অতি সাধারণ ছেলে, ওর জন্যেই বা আমি এত পাগল কেন?

দরজা খুলে দেন মা। "তুমি, বোধহয় জানো এখন সাড়ে নটা বাজে!" ঠাণ্ডাগলায় মা বলেন।

আমি কিছু বলি না। শুধু একটু তাকাই।

"এ বাড়িতে থাকতে হলে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হবে।" ঝাঁজালো গলায় মা বলেন।

আমি কোন প্রতিবাদ করি না। অপরাধীর মত মাথাটা নীচু করে চলে যাই। মাকে আজকাল আমি মাঝে মাঝে চিনতে পারি না। দিন দিন উনি যেন নিষ্ঠুর হয়ে উঠছেন আমার ওপর। রূপেনের মায়ের সমস্ত মুখেচোখে কেমন মা-মা ভাব। রূপেন বড় লাকি। ওর মা, বাবা সবাই এতো মনের মত কেন? ওঁরা আমার মনের মত। রূপেনেরও কি মনের মত? ও তো আবার আমার মায়ের প্রশংসায়

পঞ্চমুখ। আমার মাকে ও প্রশংসা করে যখন, রূপেনকে আমার খুব ভাল লাগে তখন। কিন্তু আমার কেন আজকাল ভাল লাগে না মাকে?"

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার ঘুম আসে না। আকাশ পাতাল ভাবি। এ বাড়ি থেকে মুক্তির উপায় খুঁজি।

আলো নিভিয়ে চোখ বুজেছি। খানিক বাদে মা আসেন। "রূপ্‌সি কি ঘুমিয়ে পড়লি?" ওঁর গলার স্বর একটু নরম।

আমার রাগ হয়। ভাবি, উত্তর দেব না। ভাবাই সার। আমি কথা না বলেও পারি না। বলি, "কেন?"

মা বলেন, "রূপেন এসেছিল।"

আমি অস্ফুটে বলি, "রূপেন!"

"এই চিরকুটটা দিয়ে গেছে।" মা চলে যান।

॥ সোহিনী ॥

রাহুল আমায় অবিশ্বাস করে। ও বলে, আমি নাকি এখনো মনের মধ্যে পুষে রেখেছি কল্যাণের স্মৃতি। ও তাই সেই স্মৃতিটার শেকড়-সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে চায়। পারে না। ও খুব দুঃখ পায়। আমায়ও দুঃখ দেয়। ও কেন বোঝে না কল্যাণের কাছে যে ব্যবহার আমি পেয়েছি, তা সযত্নে মনে রাখবার মত নয়? পুরনো স্মৃতি আমি মুছে ফেলতে পারিনি। কিন্তু সে স্মৃতি তো মধুর নয়। সে যে তিক্ত, অপমানের। আমারই যে ইচ্ছে করে ভুলতে। যে স্মৃতি ধূপের মত পুড়তে জানে না, শুধু কয়লার মত জ্বলে, জ্বালায়, আমি যে তার হাত থেকে রেহাই পেতে চাই। রূপ্‌সির দিকে তাকালে আমার কল্যাণকে মনে পড়ে যায়। রূপ্‌সির উদ্ধত ব্যবহার আমায় বার বার ওর বাবাকে মনে করিয়ে দেয়। তখন আমার খুব রাগ হয় মেয়ের ওপরে। মনে হয়, কল্যাণের মেয়েকে ওর কাছে পাঠিয়ে দিই। পারি

না। ওই মেয়ের মধ্যে দিয়ে কল্যাণ বার বার আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমার অসহ্য লাগে। আমি তখন টুপ্‌সি বলে চেঁচিয়ে উঠি। টুপ্‌সি ছুটে আসে। "কি মা?" আমি হাঁপাতে হাঁপাতে টুপ্‌সিকে বুকে জড়িয়ে ধরি। ওকে আঁকড়ে ধরে আমি যেন নতুন করে বাঁচার মন্ত্র ফিরে পাই।

পরক্ষণেই সব রাগ গলে জল হয়ে যায়। আমি আবার রূপ্‌সির কাছে যাই। কাছে যাবার সাহস হয় না। ও তো আমায় সহ্য করতে পারে না। আমি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওকে দেখি। ওর চিবুক, নাক হুবহু কল্যাণের মত। কল্যাণের রক্ত ওর শিরায়, ধমনীতে। তা হোক, ও যে আমারও মেয়ে। আমি ওকে গর্ভে ধরেছিলাম। ও আমার অনেক আকাঙ্ক্ষার ধন। আমার কুমারী জীবনের স্বপ্ন। আমার প্রথম বিবাহিত জীবনের দুঃখের ফসল। আমি রোজ প্রার্থনা করি ওর জন্যে, আমার জন্যে। "হে ঈশ্বর তুমি ওকে সুমতি দাও! ও যেন আমার ওপরে বিশ্বাস না হারায়! আমার মেয়ে যেন আমায় ঘৃণা না করে! আর আমি? আমি যেন জীবনের কোন অবস্থাতেই আমার মেয়ে, আমার প্রথম সন্তানকে অবহেলা না করি।

বুনির বাড়ি থেকে আমি আবার ফিরে গেছিলাম কল্যাণের কাছে। ভেবেছিলাম, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি, যদি মানিয়ে নিতে পারি।

একদিন সকালে সরিৎ আর বুনি আমায় পৌঁছে দিয়ে গেল। যাবার সময় সারাটা রাস্তা ওরা জল্পনা-কল্পনা করল কল্যাণকে নিয়ে। আমায় দেখে ও কি করবে? রাগ? অভিমান? নাকি অনুতাপ?

বুনি বলল, "ছাখ সোহিনী, কল্যাণ যা করেছে ও তার জন্যে এখন নিশ্চয় অনুতপ্ত।" আমি অন্যমনস্ক হই। বলি, "কি জানি। ওকে ঠিক বুঝতে পারি না।" বুনি চুপ করে থাকে। আমার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ বোধহয় টন্‌ টন্‌ করে। ও বলে, "ও যাই হোক, তুই-ই বা তোর অধিকার ছেড়ে দিবি কেন?"

আমার খুব ছোট মনে হয় নিজেকে। কল্যাণ যদি আমায় সত্যি না চায়? অন্ধকার, হতাশাময় ভবিষ্যৎ আমার মনের মধ্যে উঁকি মারে। আমি দিশেহারার মত রাস্তা খুঁজি। পাই না। বুঝতে পারি না, আজ কল্যাণ আমায় সত্যি সত্যি না চাইলে, কি আমার করণীয়? ওর নামে মামলা করবো? দূর! আমি ওর সাত বছরের ঘরণী, গৃহিণী? যাকে থাকতে দিতে চায় না, খরচ দিতে চায় না? সেই নালিশ নিয়ে গিয়ে হাজির হব আদালতে? ছিহ্, ছিহ্, ও আমি পারব না। আমি অসহায়ভাবে তাকাই বুনির দিকে।

আমায় সহজ করতে চায় সরিৎ। ও বলে, "সোহিনী, তুমি এখন তোমার সংসারে গিয়ে কল্যাণকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে। আর আমরা তোমার কত্তাকে খুব তাতিয়ে দেব। ওর কাছে তোমায় এমন দামী করে তুলব না? ও তোমায় এবার চোখে হারাবে।" "আহা তাই আর কি?" আমার মনে কোন তাপই সৃষ্টি হয় না, সরিতের এই ঠাট্টায়।

গালে হাত রেখে বুনি ভাবে, এর চেয়েও আর কোনো উপায় যদি থাকে কল্যাণকে বশে আনার। হঠাৎ ও সরিৎকে ধাক্কা মেরে বলে, "তার চেয়ে আমরা বরং স্রেফ বলব, তোমার ওপরে অভিমান করে সোহিনী আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, আমরা ওকে বাঁচিয়েছি।" সরিৎ উচ্ছ্বসিতভাবে বলে, "গ্র্যাণ্ড! একেবারে নাটকীয় ব্যাপার।"

আমার মন কিছুতেই সায় দেয় না। মনের মধ্যে কেবলই কু গায়। মনে হয়, যে সংসার আমি ফেলে এসেছি, সেই সংসার কি আর করতে পারব কখন? তবু বুকে সাহস বেঁধে আমি তুফানের নদী পার হতে এগিয়ে যাই। এগিয়ে যাই আমার মেয়ে রূপ্‌সির মুখের দিকে তাকিয়ে। আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, শুধু এইটুকু জেনেই আমার মেয়ের চেহারা বদলে গেছে। মুখভরা হাসি নিয়ে ও দুলে দুলে ছড়া বলে যাচ্ছে। আর আমায় বলছে, "বাবাকে গিয়ে আমি খুব বকব মা। আর বলব, কেন আমাদের খুঁজতে যায়নি বাবা বুনি মাসির বাড়ি?"

বাড়িতে ঢুকেই আমার বুকটা ধক্ করে ওঠে! কল্যাণের চেয়ে বয়সে সামান্য বড় সেই মাসি। যে আমার সংসারের শনি! যে আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নিতে চায়। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েছে সে। কল্যাণই কি নিয়ে এসেছে ওকে? বুঝতে পারি না এর জন্যেই কল্যাণ আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিল কি না?

সদলবলে আমাদের এই অভিযানে ওরা একটু অপ্রস্তুত হল। কিন্তু কল্যাণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাই সামলে নিতে ওর সময় লাগেনি। কল্যাণ হেসে বলে, "সরিৎবাবু যে! এসো এসো, কি খবর? অ্যাদ্দিনে মনে পড়ল?" "মনে তো তোমারই পড়ার কথা ছিল।" সরিতের কথার উত্তরে কল্যাণ বলল; "মনে আমার পড়েনি বলেই বুঝি মনে করিয়ে দিতে এলে? তোমার এই কর্তব্যজ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।"

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। কিন্তু আমার এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে কথাগুলো। ভুলতে পারিনি। কোনদিনই কি পারব ভুলতে? যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এসব স্মৃতি ভিড় করে গলা টিপে আমায় মারতে আসবে। রোজ নয়। যেদিন আনমনা হয়ে পেছনে ফিরে যাব।

যে বাড়িটাকে সেদিন আমার ভেবে সংসার করতে এলাম, ফিরে এসে দেখি সে বাড়ি আর আমার নেই। কল্যাণের মাসি সে ঘর কেড়ে নিয়েছে। আমার সঙ্গে আমার স্বামীর কোন কথা হয় না। সব মাসির সঙ্গে। ওরা দুজন ঘরসংসার করে আমায় বাদ দিয়ে। কোনো জিনিস ফুরিয়ে গেলে বাজার থেকে আনতে হবে সে চিন্তাটা মাসির। কি রান্না হবে না হবে, কাজের লোককে সেই বলে দেয়। যেন তারই বাড়ি, তারই ঘর সংসার। আমি দুদিনের অতিথি এসেছি। অতিথির কপালে তাও আপ্যায়ন জোটে। আমার ভাগ্যে তাও নেই। নিজের বাড়িতে কি পরের মতন থাকা যায়? আমি হাঁপিয়ে উঠি। কত কষ্ট করে টাকা জমিয়ে জমিয়ে আমি স্টিলের বাসন করেছিলাম। কত যে ঘর সাজানোর জিনিস। এখন সেই আলমারীর চাবি মাসির কোমরে।

আমি চুপচাপ থাকি। কেন না আমি জানি, আমি বাধা দিতে গেলেই ওরা ফোঁস করে উঠবে। আর সেই সুযোগই তো খুঁজছিল ওরা। কল্যাণের সঙ্গে আমার গোলমাল বেধে গেলেই সে গায়ে হাত চালাবে। নইলে কোর্টের ভয় দেখাবে। আমি দুর্বল, তাই এত নির্যাতন সয়ে যাই। সয়ে যাই রূপ্‌সির ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আর যখন ভাবি, কল্যাণ আমার মেয়ের বাবা, তখনই যেন মনটা কেমন হয়ে যায়। আমি দুর্বল হয়ে পড়ি কল্যাণের ওপরে। আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি, মেয়ের সঙ্গে বাবার আদর সোহাগের দৃশ্য। ভাবি, মেয়ে নিয়ে চলে গেলে ওকে ওর পিতৃ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। আমি তো কোন কিছুতেই পূরণ করতে পারব না ওর বাবার অভাব।

খুব অবাক লাগে, মেয়েকে যখন কল্যাণ আদর করে, তখন কি ওর মনে হয় না এই মেয়েকে ও পেয়েছিল কিভাবে? কার গর্ভজাত সন্তান রূপ্‌সি? আর মায়ের প্রতি বাবার এই দুর্ব্যবহার মেয়ে কি লক্ষ্য করছে না? রূপ্‌সির সামনে কোন্‌ উদাহরণ রাখছে কল্যাণ? আমি শুধু ভাবি আর ভাবি। কল্যাণকে এসব বলা হয় না।

মিলিমাসি আর কল্যাণ একঘরেই ঘুমোয়। আমার বিয়েতে পাওয়া খাট দুটো জোড়া লাগিয়ে নেওয়া হয় রাত্তিরে। সকালে খাট দুটো আলাদা হয়ে যায়। সেই জোড়া খাটের প্রথমে শোয় মিলিমাসি তারপর কল্যাণ, কল্যাণের পাশে আমি আর আমার মেয়ে। মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে আমি গুটিসুটি মেরে কোণের দিকে পড়ে থাকি। আমার দু চোখের পাতা আর বন্ধ হয় না। ভয় হয়, পাছে মেয়ের ঘুম ভেঙে যায়। জেগে জেগে আমি কল্যাণ আর মাসির অবৈধ প্রেমের নীরব সাক্ষী থাকি। ওর ঘর ছেড়ে চলে যেতে চাইলেও ওরা আমায় চলে যেতে দেয় না। বুঝতে পারি, ওরা লোকের চোখে ধুলো দিতে চায়। এত বড় অপমান আমায় মুখ বুজে সয়ে যেতে হয়। আমার সেই ফুলশয্যার খাট, যে খাটে কল্যাণ আমার কুমারী দেহ প্রথম

স্পর্শ করেছিল, যার প্রথম স্পর্শের শিহরণে আমি স্বর্গীয় সুখ পেয়েছিলাম, আজ সেই খাটটাকে আমার কণ্টক-শয্যা মনে হয় কেন? কল্যাণ এত নিষ্ঠুর!

বুঝতে পারি না, আমায় কল্যাণের বউ করে কেনই বা নিয়ে এল মাসি? সে রহস্য আমার কাছে অজানাই থেকে গেল। আমার বিয়ের দিনও দেখেছি, বরযাত্রীদের ভিড়ে মিলিমাসিকে। ওর চোখ দুটো যেন জ্বলছিল। ছাঁদনাতলায় বসে যখন কল্যাণের হাত আমার হাত এক করে মন্ত্র উচ্চারণ করাচ্ছিলেন পুরোহিত, তখন আমার হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেছিল মাসির সঙ্গে। ওর চোখে দেখেছিলাম সেই একই আগুন। আমার সেই পরম আনন্দের দিনেও ভাঙা নিশ্বাস ফেলেছিলাম মাসির জন্যে। বেচারী স্বামীর ঘর করতে পারেনি। বিয়ের দু বছর পরই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল।

কয়েক দিনের মধ্যে টের পেয়েছিলাম আমার কপাল ভেঙেছে। মানুষ যে অমৃত লাভের উদ্দেশ্যে বিয়ে করে, সে অমৃত আমার ভাগ্যে জোটেনি। আমার ভাগ্যে বিয়ে মানে শুধুই গরল। চোখের জল ফেলতে ফেলতেই আমার বাকী জীবন কাটবে। আমি মিলিমাসির খেলার পুতুল। আমায় নিয়ে খেলবে বলে ও কল্যাণের সাথে আমার বিয়ে দিয়েছে। আমায় আগুনের মধ্যে বসিয়ে রেখে ও আমার সর্বনাশ দেখবে। এতেই ওর সুখ, এই ওর আনন্দ। কিন্তু আমি তো ওর কোন ক্ষতি করিনি। আমায় এত বড় শাস্তি ও দিতে গেল কেন? নাকি একটি নিরীহ মেয়ের সঙ্গে কল্যাণকে বিয়ে দিয়ে ও সমাজের চোখকে ফাঁকি দিল? ও কি ভেবেছিল, এই মেয়েটি কল্যাণের মত স্বামী পেয়েই বর্তে যাবে। কোন প্রতিবাদ করবে না তার অন্যায়ের, তার ব্যভিচারের?

আমাদের কলকাতার ফ্ল্যাটে মিলি এলে ও অন্য ঘরেই শুতো প্রথম

প্রথম। অনেক রাত্তিরে আমি ঘুমিয়ে পড়লে কল্যাণ মাসির ঘরে চলে যেত। যেদিন প্রথম জানতে পারি সেদিন আমি মুষড়ে পড়লেও ওদের বুঝতে দিইনি। ভাবি, চোখের পর্দা সরে গেলে ওরা হয়ত যা খুশি তাই করবে। আমার আড়ালে করছে করুক। কিন্তু কদিন? আমি তো ঈশ্বর নই? এতো ক্ষমা আমার আসবে কি করে? একদিন আমি বাধা দিই। কল্যাণের সামনে রুখে দাঁড়াই। বলি, "ও ঘরে রাত কাটাও কেন?"

বিচ্ছিরি হাসি হাসে কল্যাণ। "এতদিনেও যদি বুঝতে না পেরে থাকো·······।"

"ছিঃ ছিঃ, তুমি একটা নীচ। তুমি জঘন্য। তুমি অমানুষ।"····

"বলে যাও, বলে যাও, আর কি বিশেষণ আছে তোমার।"

মাথা নীচু করে মিলিমাসি বসে থাকে। আমি রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যাই।

এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় প্রায়ই। মিলিমাসি যে কদিন থাকে সেই কদিন কল্যাণের পৃথিবী যেন অনেক বড়। হাসি, কথা, আনন্দ। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে পড়ে, কল্যাণ। মাসি চলে গেলেই ওর পৃথিবী আবার অন্ধকার। একটা ছাদের তলায় আমরা থাকি এইমাত্র। কোন সম্পর্ক নেই দুজনের। এইভাবে বোবার মত থাকা যায়? আমি সংসারের কাজকর্ম করি, কল্যাণ অফিস করে। দুজনে যখন এক জায়গায় হই, তখন আমাদের কথা ফুরিয়ে যায়। আমার কান্না আসে। কল্যাণের ঘনসান্নিধ্য খুঁজি। ওকে বার বার বলি, "বল, বল, কোন ত্রুটি আছে আমার?"

"আমি তো বলিনি তোমার কোন ত্রুটি রয়েছে।"

"তবে কেন মিলিমাসি·······?" আর বলতে পারি না। আমার গলা আটকে যায়।

কল্যাণ বলে, "এ বিষয়ে তুমি আমায় কোন প্রশ্ন করো না।

"মিলিকে ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

আমি দমে যাই। বলি, "তবে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন?

"ইচ্ছে হয়েছিল।"

"ইচ্ছে? তোমার ইচ্ছের দাম দিতে গিয়ে আমার জীবন তছনছ হবে নাকি?"

"তোমার কি ক্ষতিটা আমি করছি?"

"ক্ষতি? এর চেয়ে বড় ক্ষতি আমার আর কি হতে পারে?"

প্রথমদিকে কল্যাণ আমার প্রতি অন্যান্য কর্তব্যের অবহেলা করেনি। আস্তে আস্তে ওর সেই বোধটাও হারিয়ে যায়। তখন ও অন্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ে আমার ওপর। আমি যা করি, তাতেই রাগ। আমায় কোথাও বেরুতে দেয় না, কারো সঙ্গে মিশতে দেয় না। টাকা-পয়সা দেয় না। আমায় মার-ধোর করে কারণে-অকারণে। এ বাড়িতে মিলিমাসির আসাটাও বেড়ে যায়। ওর থাকার মেয়াদ ক্রমেই দীর্ঘ হয়।

আমারই সংসার থেকে আমার মেয়ের জন্যে যখন দুধ চাইতে হয় মিলিমাসির কাছে, কিংবা এক পেয়ালা চায়ের জন্য মিলিমাসির অনুমতি নিতে হয়, তখন আমার মাথাটা গরম হয়ে যায়। কোন উপায় নেই চুপ করে থাকা ছাড়া। সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চা খায় মিলিমাসি আর কল্যাণ, আমি বাদ পড়ে যাই। চা-চিনির কড়া হিসেব হয় আমার বেলায়। কল্যাণকে বলতে গেলে ও আমায় ধমক মারে। মাসি মিথ্যে কথা বলে। রূপ্‌সিকে দুধ না দিয়ে মিলি-মাসি বলে, "এই তো তুমি ওকে দুধ দিলে।" কল্যাণের সামনে যদি চাই, তাহলে মাসি আরেকটা কায়দা করে। দুধে প্রচুর জল মিশিয়ে ঠক্ করে এক গ্লাস দুধ এনে রাখে আমার সামনে কল্যাণকে দেখিয়ে। সে দুধে যে জল সে কথা বলা যায় না কল্যাণকে। ও আমায় মারতে ওঠে। বলে দিনরাত শুধু ওর সঙ্গে ঝগড়া—আর ঝগড়া। আমার তখন

মনে হয় আমি যেন সতীনের ঘর করছি। নইলে, এ যেন সেই সুয়োরাণী আর দুয়োরাণীর ইতিহাস। মিলি সুয়োরাণী আর আমি দুয়োরাণী।

আমাদের পরিচিত লোকজন এলে আমার আর আগের মত তাদের সঙ্গে কথাটথা বলা হয় না। মিলিই আসর জঁাকিয়ে বসে। আমার চেনা লোকেরাও এখন অচেনা হয়ে গেছে। কল্যাণ আর মিলি আমার নামে তাদেব কাছে অনেক বাজে কথা বলতে শুরু করেছে। আমি যখন বুনি‍র বাড়িতে ছিলাম, ওরা তখন বলেছে, আমি কোন যুবকের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গিয়েছি। নিজের এই কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারি না মুখ ফুটে। শুধু সয়ে যাই।

মাসি আমার সঙ্গে গণ্ডগোল বাধানোর ছল খেঁাজে। ও আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে নানা মন্তব্য করে। বলে, "মুরোদ, শেষ পর্যন্ত তো ফিরতেই হল। কপালগুণে মানুষ এমন স্বামী পায়। এবারে ওই স্বামীকে দিয়ে তোকে লাথি খাওয়াবো। তোকে এই বাড়ি থেকে বিদেয় করব।"

আমি না শোনার ভান করে থাকি। কি করব—স্বামীর জোরেই সব জোর। সে জোরই আমার যখন নেই।

মিলিমাসি কর্কশ গলায় আমায় অভিশাপ দেয়, "মেয়ে নিয়ে তোকে পথে পথে ঘুরতে হবে।"

আমি যদি বলি, "চুপ করো। তোমার এত বড় সাহস, আমায় ওসব বলো।"

ও তখন সিংহের মত গর্জে ওঠে। ও আমায় শাসায়, "আজ কল্যাণ আসুক, হবে একচোট।"

এই কথা বলে ও আমার শোবার ঘরে আমারই বিয়েতে পাওয়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আমারই চোখের সামনে সাজে কল্যাণকে ভোলানোর জন্যে। কল্যাণ এলে মিলিমাসি এমন নায়িকা-নায়িকা ভাব করে! চোখ টান করে ও অপলকে তাকিয়ে থাকে কল্যাণের দিকে। চোখ দুটো ছলছলে, যেন কোন অভিমানী শ্রীরাধা।

কল্যাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে, "কি হলো? কি হলো?"

তখন মিলিমাসি আমার নামে রসিয়ে রসিয়ে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যেকথা বলে। আমার ক্ষীণ গলার স্বর চাপা পড়ে যায় মাসির কান্না-কান্না গলার চেঁচানিতে। কল্যাণ তেড়ে আমায় মারতে আসে। প্রায়ই মারে।

কল্যাণ এলে ওরা কোনদিন বেড়াতে বেরোয়। কোনদিন ঘরে বসেই হাসি, ঠাট্টা, ইয়ার্কি এই সব কত কি চলে। আমি বলে যে কেউ বাড়িতে আছি, সেকথা ওরা কেউ ভাবে না। কল্যাণ তো আমার সঙ্গে কথাই বলে না। আগে আগে আমার চোখ ফেটে জল আসত, এখন আব আসে না।

রাহুল আমায় পুনর্জন্ম দিয়েছে। ও যদি আমার জীবনে না আসত, তাহলে আমি বুঝতে পারতাম না বিবাহিত জীবনের তাৎপর্য কি? স্বামী-স্ত্রীর দুজনের সংসার কত মধুর হতে পারে। দুজনের বোঝাপড়া, একজনের ওপরে আর একজনের আস্থা, সহানুভূতি না থাকলে সংসার করা যে কঠিন হয়, তা আমার চেয়ে আর কে বেশী বোঝে? কল্যাণের সঙ্গে যে ঘর আমি করেছি, সেখানে শুধু ছিল একতরফা কর্তব্য। কল্যাণ ছিল স্বার্থপর, অনুদার। ও আমার কাছ থেকে শুধু পেয়েই গেছে। দেয়নি কিছুই। আমাদের বিয়ের প্রথম রাত থেকেই কল্যাণ আমায় বুঝিয়েছিল, স্বামী হিসেবে সে যা খুশি তাই করতে পারে, বউ হিসেবে আমায় সবই মেনে নিতে হবে। কিন্তু সেই মেনে নেওয়া কি মেনে নেওয়া, কতটুকু মেনে নেওয়া, সে কথা আমি বুঝিনি সেদিন। আমি হাসি মুখে মাথা নেড়ে বলেছি, "হে স্বামিন, বলুন আপনার কি হুকুম।" কল্যাণ হেসেছে। তারপর কদিন পর তার হুকুমের কথা যখন আমায় বলেছে, তখন আমি শুনে চমকে উঠেছি। কল্যাণ বলেছে, "তুমি তোমার স্বামীকে আর একজনকে দান করতে পারো?" "সে কি! আহা ঢং।" আমি ঠাট্টা করে কথাটা উড়িয়ে দিতে চেয়েছি।

কল্যাণ বলেছে, "ঢং নয়। সময় হলেই বুঝতে পারবে। আমি তোমায় বিয়ে করেছি আর একজনের অনুরোধে। তার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"—শিকারী ব্যাধের তীর ছিটকে এসে পড়েছে আমার গায়ে। আমার হৃৎপিণ্ডের রক্তে ধীরে ধীরে আমার মন ধুয়ে গেছে।

অনেক রাত্রিতে খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে কান্নায় ভেঙে পড়ি। মন বিদ্রোহ করে। ভাবি, আর নয়। এবারে মেয়েকে নিয়ে চলে যাই। কিন্তু যেতে আর পারি কই? লেখাপড়া শিখেছি। রূপসিকে মানুষ করে আমাদের মা মেয়ের আলাদা জগৎ তৈরী করতে পারি। কিন্তু তা চাইনি। রূপ্সি যেন তার বাবাকে না হারায়। আমি শুধু এইটুকু চেয়েছি। ওর জন্যেই আমি মুখ বুজে সহ্য করেছি কল্যাণের কাছ থেকে পাওয়া অপমান অত্যাচার।

মিলিমাসির জন্যে কল্যাণ এমন পাগল যে মেয়ের দিকেও ওর আর এখন তেমন মন নেই। রূপ্সিকে ও এড়িয়ে চলে। শিশুরাও বোধহয় অন্তর্যামী। তারাও মন বোঝে। রূপ্সিও আগের মত বাবার কাছে ঘেঁষে না। আগে কল্যাণ আর আমার মধ্যে সেতু রচনা করত মেয়ে। মেয়ের মুখ থেকে কল্যাণ আমার নাম হাজার বার শুনতো। আমাদের দুজনের সম্পর্ক যত দূরেরই হোক, কখনো কখনো এই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতো মেয়ে। আজকাল মা আর মেয়ে দুজনেই এত দূরের।

আমি বুঝতে পারছিলাম একটা দারুণ রকম বিপর্যয় ঘটতে চলেছে। এই অঘটনের হাত থেকে আমার রেহাই নেই। মুখ কালো করে ঘুরে বেড়ায় রূপ্সি। ওর মধ্যে আর দেখি না সেই আগের মত দুষ্টুমি। ও মিলিমাসিকে সহ্য করতে পারে না। শুধু আমায় চায়। আমার আঁচল ধরে ঘুর্ ঘুর্ করে ঘুরবে। আর ঘ্যান্ ঘ্যান্ করবে। আমি বুঝতে পারি না, আমার কি করা উচিত। আমি যে আমার মেয়েকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখি। এই আবহাওয়ায় থাকলে সে কি মানুষ হবে?

ওভাবে আর আমার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হল না বেশি দিন। কল্যাণ রোজই আমায় বলে, "তুমি ডিভোর্সে রাজী হও।" আমি কান্নাকাটি করি। রাজী হই না। এই নিয়ে ও বেশ অশান্তি করে। শেষ পর্যন্ত ও ভয় দেখায় মুসলমান হয়ে যাবে। ও মুসলমান হলে আমায় সহজেই তালাক দিতে পারবে।

নিজেব ওপরে আমার কেমন ঘেন্না হয়। এভাবে জোর করে থাকার কোন মানে হয় না। তবু আমি মামলার কথা চিন্তা করি না। ভাবি, যে স্বামী আমায় চায় না, মামলা করে তার ওপর অধিকার খাটাতে যাব কেন?

আমার জন্যে ওকে ধর্ম বদলাতে হবে? না না। তার চেয়ে আমি সরে যাই। এবারে আর আত্মহত্যার কথা মনে হয় না আমার। মনে হয় না কোন সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে বাস করার কথা। আমি জীবিকার সন্ধানে চাকরীর জন্য শুধু দরখাস্ত করি। কোর্টে দাবী করে কল্যাণের কাছ থেকে টাকা নিতেও আমার রুচিতে বাধে।

ও আমায় চায় না এই তো যথেষ্ট অপমান। স্বামী যাকে চায় না, একজন মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে অপমানের বিষয় আর কি হতে পারে?

রূপসির হাত ধরে এই বিরাট কলকাতা শহরের রাস্তায় আমি আবার বেরিয়ে পড়ি। এখানে ওখানে চাকরী, সমাজের বদনাম, স্বামীর কাছে পাত্তা পাইনি বলে অনেক অপবাদের অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে চলি। যার যা পাওনা তাকে তা পেতেই হয়। আমার এই ভাগ্যের জন্যে আমি কাউকেই দায়ী করি না। শুধু আমার অতৃপ্ত মন মেয়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন খোঁজে। ওর ছোট্ট বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে আশ্রয় খুঁজি।

আমার ছাব্বিশ বছরের অপমানিত যৌবন কেঁদে কেঁদে ফেরে। বুঝতে পারি না জীবনের এই লম্বা পথ আমি একা একা পাড়ি দেব কি করে?

তবু নিজের কথা ভুলে আমি আমার সাধ্যের বাইরে অসাধ্য সাধন করে চলি। মেয়ের কোন ত্রুটি রাখি না। সে আগেও যেমন ভাল স্কুলে যেত, এখনো তেমন যায়। আগেও বায়না করলে যা পেত, এখনো তাই পায়। দক্ষিণ কলকাতারই কোন একটা জায়গায় আমি একটা ঘর ভাড়া করে থাকি। কেরানীর চাকরী করি কোন এক অফিসে। সন্ধ্যেবেলা ট্রামে, বাসে বাদুড় ঝোলা হয়ে ফিরে তার পর আবার ছাত্র পড়াই। মেয়ে আমার সঙ্গেই থাকে। ওকেও কিছু ছবির বই-টই দিয়ে বসিয়ে রাখি। ঈশ্বর অকৃপণ নন। তিনি একদিকে মারেন, অন্যদিকে দেন। আমি যাদের বাড়ি ভাড়া থাকি, তারা মেয়েকে বড় ভালবাসেন। আমার অনুপস্থিতিতে তাঁরাই আমার মেয়েকে দেখেন-টেখেন। এ বাড়ির গিন্নিকে ও দিদা বলে ডাকে। দুপুরে স্কুল থেকে ফিরলে ও তো আমায় পায় না। তখন আমি অফিসে। ও ওর পাতানো দিদার কাছে ভাত খায়। পাতানো দিদার বুকের মধ্যে শুয়ে শুয়ে গল্প শোনে। ঘুমোয়।

সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে, আমি আমার মেয়ের নামে নালিশ শুনি। কৃত্রিম নালিশ। শুনে আমি কৃত্রিম চোখ পাকাই মেয়ের দিকে। মেয়ে আদুরে গলায় তার দিদার নামে আমায় নালিশ জানায়। আমি তখন বলি, "দিদা তো ভারি দুষ্টু।"

ছুটির দিনে মেয়েকে নিয়ে বাইরে-টাইরে বিশেষ বেরনো হয় না। আমি পয়সার হিসেব করি। আমার অফিসের টিফিন, বাস ভাড়া, মেয়ের স্কুলের মাইনে, টিফিন, তার বায়না, স্কুলের বাস ভাড়া, আমাদের ঘর ভাড়া, বাজার........। এই গোনাগুনতির পর যদি কিছু জমে যায় কখনো, আমি সেটা মেয়ের ভবিষ্যতের জন্যে ফেলে রাখি।

ছুটির দিনে হাঁটতে হাঁটতে মেয়েকে নিয়ে পার্কে গিয়ে বসি। মেয়ে তার বাবার কথা বললে আমি এড়িয়ে যাই।

রাহুলের সংগে আলাপ হয় ঘটনাচক্রে। বুঝতে পারিনি স্রোতের

টানে ভাসতে ভাসতে আমি ওর খেলায় বাঁধা পড়ে যাব। আজ রাহুলের সঙ্গে রূপসির যা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে সেদিন কিন্তু তেমন ছিল না। ছোট্ট রূপসির মন কেড়ে নিয়েছিল রাহুল। একা একা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। রাহুল আমার ভাবনার ভাগ নিল। আমায় ও বাঁচতে শেখাল। পুরুষ জাতের প্রতি আমার ঘৃণা, অবিশ্বাস যা তৈরী করেছিল কল্যাণ, রাহুল তা ভেঙে দিতে চাইল। ও বলল, "তুমি আমায় বিশ্বাস কর সোহিনী, একজন তোমায় ঠকিয়েছে বলেই কি সবাই তোমায় ঠকাবে? আমি তোমায় ভালবাসি। আমি তোমায় বুঝতে চাই। আমি তোমায় স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাই। আমার ভালবাসায় কোন ফাঁকিই থাকবে না।" তবু আমি ওকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কোন কথাই দিতে পারিনি। তারপর একদিন বুঝতে পেরেছি, ও আমার কাণ্ডারী। ওর হাত ধরেই আমায় এই দুঃখের সাগর পার হতে হবে। কিন্তু মেয়ে? আমার রূপসির কি হবে? আমার মেয়ে যে আমার প্রাণ-ভোমরা, নিজের সুখ খুঁজতে গিয়ে আমি ওকে দুঃখ দিতে পারি না।

রাহুল আমায় বোঝায়, "তোমার মেয়ে তো আমারও মেয়ে, সোহিনী। জন্মসূত্রে যে বাবা হয়, সে যদি তার মেয়ের ওপর কোন কর্তব্যই না করে, তবে সেই বাবার ওপরে মেয়ের কোন মোহই রাখা ঠিক নয়। রূপসির বাবা আমি নই। আমি যদি বাবার দায়িত্ব পালন করি, তবে কি আমি তোমার মেয়ের বাবা হতে পারি না?" ওর এত বড় কথায় কোন উত্তর দিতে পারিনি আমি শুধু। বার বার ভেবেছি, রূপসি যখন বড় হবে, তখন ওর মনে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে না তো?

রাহুল বলেছে, "না। যদি হয়, ওর মনের সেই দ্বন্দ্ব ঘোচানোর জন্য আমিই তো রইলাম। ও ছেলেমানুষ। ও ভুল করলেও আমি করব কেন? তুমি কি আমার ওপরে এই বিশ্বাসটুকু রাখতে পারো না?"

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। আমার মন তবু সায় দেয়নি। দ্বিতীয়বার খাঁড়ায় ঝুলতে আমি রাজী হইনি। বলির পাঁঠা একবারই হয়েছি। আমি চাইনি রাহুলকে বিয়ে করে ফের ঘর বাঁধতে। ঘর যার কপালে লেখা নেই, সে ঘর পাবে কি করে? তাই পাঁচ বছর ধরে অনেক বুঝিয়ে রাহুল আমায় রাজী করাতে পারেনি।

জানি না কবে থেকে আমার মনের জোর হারাতে শুরু করেছি। সিঁথির অস্পষ্ট সিঁদুরের রেখাটুকু আমি ঘষে তুলে ফেলতে চেষ্টা করেছি। আমি আমার পুরোনো সংস্কার ঝেড়ে ফেলে ভাবতে শুরু করেছি, আমার স্বামী নেই। আমি কল্যাণের নামে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা তুলেছি।

॥ টুপ্‌সি ॥

সকালবেলা বাড়িতে বেশ বাকযুদ্ধ হয়ে গেল। সামান্য একটা কলম নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড। আমার কলমের নিবটা নষ্ট করে ফেলেছে টুপ্‌সি। ও খুব জোর দিয়েলেখে। ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া অক্ষর। আমি ওকে অনেকদিন বলেছি, আমার পড়ার টেবিলে হাত-ফাত না দিতে। ও তবু শোনে না। আমার এই কলমটার ওপরেই ওর যত লোভ। আমি ওকে ডেকে ধমকাই, "ফের তুই আমার কলমে হাত দিয়েছিস?" "বেশ করেছি।" "দাঁড়া দ্যাখাচ্ছি মজা!" আমি তেড়ে যাই। টুপ্‌সি বুক ফুলিয়ে আসে, "কি করবি কর না।" আমি থমকে যাই ওর এই বেপরোয়া ভাব দেখে। ও আমার চেয়ে অন্ততঃ বছর দশেকের ছোট। আমি চেঁচাই, "যা করব, তুই বুঝতে পারবি।" "ওমা মা দি···দি·······।" টুপ্‌সি কাঁদো কাঁদো গলায় চেঁচায়। রাহুলবাবা দৌড়ে আসেন, "কি হল? কি হল?" ব্যাপারটা না শুনেই উনি চোখ রাঙিয়ে আমায় বলেন, "ননসেন্স।" শুধু একটা শব্দ। খুব খারাপও নয় তার মানে। কিন্তু শব্দটা উচ্চারণের মধ্যে যে এতটা ঘৃণা থাকতে পারে, ওঁর চোখের চাউনির মধ্যে যে এতটা অবজ্ঞা থাকতে পারে এর আগে

আমি আর কখনও বুঝিনি। আমার যেন কি হয়। মুহূর্তে মাথার মধ্যে একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে যায়।

আমি ঠাস করে টুপ্‌সির গালে একটা চড় মারি। "তোমার এত বড় সাহস। আর কতদিন আমাদের জ্বালাবে।" বলতে বলতে রাহুল-বাবার গলা ভেঙে যায়। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

আমার নিজের বাবা হলেও একথা বলতেন। হয়ত তাঁর কাছ থেকে পাওয়া এই অপমান আমি হজম করে যেতাম। কিন্তু উনি আমার বাবা নন। উনি টুপ্‌সির বাবা। এ বাড়ি তো আমার বাড়ি নয়। টুপ্‌সির বাড়ি। টুপ্‌সির বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমি টুপ্‌সিকে মেরেছি। আর ওরই বাবার সামনে।

রাহুলবাবা চুপ করে রইলেন না। বলতে লাগলেন, "তোমায় আমি আর বেশী দিন সময় দেব না। নিজের রাস্তা এবারে নিজেই তৈরী করে চলে যাবে।" টুপ্‌সিকে জড়িয়ে ধরে পাশের ঘরে চলে যান রাহুলবাবা। আমি আমার ভাঙা কলমটা হাতে করে তখনো দাঁড়িয়ে থাকি। আমার দু' গাল বেয়ে জল পড়ে। হাতের চেটো দিয়ে জল মুছি।

হলুদ মাখা হাত মুছতে মুছতে মা এসে দাঁড়ান। আজ আর রাগ হয় না মায়ের ওপরে। আমি রুদ্ধ অভিমানে মায়ের দিকে তাকাই। মাও তাকান আমার দিকে। ওঁর চোখ দুটোও কি ছল্ ছল্ করে? বুঝতে পারি না। কিছুক্ষণ দু' জনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। আমার ইচ্ছে করে মায়ের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদি। পারি না। ভাবি, মা যদি দূরে সরে যান। মায়ের যদি অসহ্য লাগে।

এত তুচ্ছ বিষয় থেকে যে এ রকম একটা বিশ্রী ঘটনা তৈরি হবে ভাবিনি। ভাবিনি আজ সারাটা দিন আমার চোখের জলের ভেতর দিয়ে কেটে যাবে।

পড়ার টেবিলে বসে আমি খানিকক্ষণ আঁকিবুকি কাটি। তারপর শাড়ীটা পাল্টে বেরিয়ে পড়ি। কোথায় যাব কি করব কিছুই জানি

না। গেট খুলে বেরিয়ে আসার সময় পেছন ফিরে একবার তাকাই। শেবার ঘরের জানলা ধরে মা বোধহয় দাঁড়িয়ে আছেন।

একদিন মায়ের শরীরের মধ্যে আমি মিশেছিলাম। তখন মা না খেলে আমার খাওয়া হত না। মা না ঘুমুলে আমার বিশ্রাম হত না। সেই আমরা একই মানুষ আজ কেমন দু' ভাগ হয়ে গেছি। মায়ের খাওয়া হলে, আমার খাওয়া হয় না। মা যেখানে নিরাপদ, আমি সেখানে নই। মায়ের আশ্রয় আছে। আমার নেই। রাহুল-বাবার কথাগুলো কানের মধ্যে বাজে। "আর কতদিন আমাদের এভাবে জ্বালাবে?" আমি যেন আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার গা জ্বলে যায়। কান জ্বলে যায়। বুক জ্বলে যায়। আমি বুঝতে পারি না এই জ্বালা আমি নেভাব কি করে? কোথায় গেলে আমি শান্তি পাব? কার কাছে? যার কাছে গেলে কিছু বলতে হবে না। সে নিজেই বুঝে নেবে সব। রূপেনকে কি এখন বাড়ি পাওয়া যাবে? না থাক, রূপেন না। ও বুঝবে না। বুঝতে পারবে না আমার এই মুহূর্তের যন্ত্রণা। দীপঙ্কর, অতনু, শ্রীময়ী আমি কারো কাছে যাব না। ওরা সবাই আমার বড় কাছের। তবু আমায় ছুঁতে পায় না ওরা।

কেন আমার এই দাহ? কেন আমার এই জ্বালা? কে দায়ী এ জন্যে? কোথায় আমার সেই বাবা? যিনি আমায় তাঁব চমৎকার পরিকল্পনা মত নিয়ে এসেছিলেন? নাকি আমি তাঁর মুহূর্তের দৈহিক লালসার ফল? বুঝতে পারি না। আমি কিছু বুঝি না। আমি আমার মাকে বুঝতে পারি না। বাবাকে বুঝতে পারি না। আমি অবুঝের মত আর কত দিন কাটাবো? আর কত দিন দুঃখে ভরা মনের বোঝাটাকে বয়ে নিয়ে বেড়াব?

আমি হাতড়াই আমার মনের অলিগলি। তন্ন তন্ন করে খুঁজি আমার বাবার কথা, আমার বাবার মুখ, আমার বাবার স্মৃতি। বড় ঝাপসা অস্পষ্ট। এত ছোটবেলার কথা কি কারো মনে থাকে?

তখন বোধহয় আমার বয়স চার।

কাল রাতে ভবানী সিনেমার সামনে দেখা ভদ্রলোকের কথা মনে হয়। বাবা বোধহয় এসেছেন কলকাতায়। কিন্তু এই এত বড় শহরে হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে আমি কোথায় খুঁজব আমার বাবাকে? ঘোলাটে কাঁচের মধ্যে আমি যেন ছবি দেখি। একটা মুখ, একটু হাসি। আমার হাত থেকে পুতুল কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখত। আমি রেগে গেলে মজা পেত। আমার নরম গালে দাড়ি ঘষে আমায় কাঁদাত। বাবা অফিস যেত। ফেরার সময় মাঝে মাঝে চকলেট দিত।

খুব বেশী মনে নেই বাবার কথা। বাবাকে আমি তো বেশী কাছে পাইনি। মায়ের কাছে যেটুকু শুনেছি, সেটুকু জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে কিছু কল্পনা, কিছু স্মৃতি মিলিয়ে মিশিয়ে আমি আমার বাবাকে গেঁথে নিয়েছি।

মা তো পছন্দ করেন না আমার বাবাকে। কিন্তু আমায় যখন আমার বাবার কথা বলতেন, তখন "তোমার বাবা", "তোমার বাবা" বলে আমার মনে বেশ একটা দুর্বলতা সৃষ্টি করতেন। এ কাজ মা কেন করতেন? তবে আমায় না নিয়ে এলেই হত? উনি চলে আসতেন। আমি না হয় থাকতুম আমার বাবার কাছে।

আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত রাস্তা দিয়ে হাঁটি। মোড়ের মাথায় আমার সঙ্গে অতনুর দেখা হয়। আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। এই সময় ওকে খুব বিরক্তিকর লাগে। কালও রূপেনের কাছে যাবার আগে ও আমার পথ আগলেছিল। ও একটা অপয়া। ওর মুখ দেখেছিলাম বলেই রূপেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

"কোথায় যাচ্ছ?" অতনু চোরা চাউনি ছোড়ে।

আমি বলি, "জাহান্নামে।"

অতনু বলে, "তুমি আমার ওপর খুব চটেছ মনে হচ্ছে?"

"চটার মত কি কোন কারণ ঘটেছে, তুমি বল।"

অতনু অপ্রস্তুত হয়। বলে, "সে তো তুমিই বলতে পারবে।"

আমি এগোই। অতনু আমার পায়ে পায়ে হাঁটে।

"আচ্ছা অতনু, গণ্ডারের চামড়া খুব শক্ত, তাই না?"

"হ্যাঁ।" অতনু বলে, "কিন্তু হার্টটা নরম কি?"

"আমরা কি গণ্ডারের হার্ট নিয়ে খুব মাথা ঘামাই?"

"যারা হার্টের কারবারী তারা ঘামায়।"

"রক্ষে কর বাপু। আমি সে দলে নই।" আমি জ্বলে উঠি।

"তোমায় কিন্তু আজ খুব অন্যরকম দেখাচ্ছে।" অতনু বলে।

আমি জবাব দিই না।

অতনু বলে, "তুমি কোথায় যাচ্ছ বললে আমার একটু উপকার হয়।"

"কি আশ্চর্য!"

আমি ভূরু বেঁকিয়ে বলি, "তুমি ছায়ার মত কেন ঘিরে রাখছ অতনু। তুমি কি বুঝতে পারছ না, তোমার সঙ্গ আমার খুব অসহ্য হয়ে উঠছে?"

"বেশ আমি চলে যাচ্ছি। মনে রেখ আমায় বোধহয় তোমার দরকার হবে।"

"না দরকার হবে না আশা করি। তুমি আমায় রেহাই দাও।" আমি প্রায় ছুটে গিয়ে রাস্তায় থেমে থাকা ঢাকুরিয়ার মিনিবাসটায় উঠে পড়ি। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। আমি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছি।

নিতান্তই উদ্দেশ্যহীনভাবে উঠে পড়লাম। কোথায় যে যাব জানি না।

আমি কি সারা জীবন ধরেই এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াব? কোথাও আমার স্থিতি হবে না? "ঈশ্বর তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমায় শান্তি দাও।"

লেক মার্কেটের কাছে প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষে থেমে যায় বাসটা। চারিদিকে "গেল গেল" রব। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে। লোকটা

ছিট্‌কে গিয়ে পড়ে ট্রাম লাইনে। আমাদেরই বাসের ধাক্কায়। লোক-জন ছুটে আসে। ড্রাইভারের আর পালানো হয় না। আমাদের বাসের যাত্রীরা নেমে পড়ে রাস্তায়। আমি কৌতূহলবশত এগিয়ে যাই আহত লোকটির দিকে। গায়ে হলদে রঙের বুশসার্ট, শ্যামবর্ণ, নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো সেই মুখ। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে তার গোটা শরীর। আমি পাগলের মত দৌড়ে যাই।

"সরুন, সরুন, উনি আমার বাবা।"

হ্যাঁ, কোন ভুল হয়নি। কালই তো এঁকে দেখেছি টালিগঞ্জে। আমি ওঁর রক্তমাখা মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিই। ভদ্রলোক তখন বেহুঁশ।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কথা ছিটকে আসে, "হায়, হায়! আহা, মেয়েটির চোখের সামনে বাবা এভাবে....।"

আমি উত্তেজিতভাবে অপরিচিত মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলি, "একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন ?"

উৎসাহিত কয়েকজন যুবক, যারা চিরকালের পরোপকারী যুবক, এগিয়ে আসে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

হুজুগে মানুষের দল যারা, যাদের অপার কৌতূহল, তারা হাজার প্রশ্ন নিয়ে আমায় ছ্যাখে। "উনি কি ঐ মিনিবাসেই ছিলেন ?"

আর একজন বলেন, "আরে না, রাস্তা পার হচ্ছিলেন। মিনিবাসটা দৈত্যের মত এসে........"

"না দাদা, ঘটনাটা তা নয়। ভদ্রলোক বাস স্টপে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন সময়!"

"আপনি বুঝি এই বাসটাতেই ছিলেন ?"

আমার মাথা ঘুরতে থাকে। বুকের মধ্যে অস্থির পাখার ঝাপটা। আমি কি ফিরে পাব না আমার বাবাকে ? ঈশ্বর, তুমি এত অকরুণ হয়ো না। সকাল থেকে কিছু খাইনি। আমার গা গুলিয়ে ওঠে। আল্‌তার মত লাল টাট্‌কা রক্তে আমার দুহাত ভরে যায়। হিতৈষী

কয়েকজন ততক্ষণে জল নিয়ে এসেছেন। ওঁর মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ভিড় সরানোয় ব্যস্ত। কোথা থেকে যে কি ঘটে গেল আমার মাথায় যেন কিছুই ঢোকে না তখনো। আমি ওঁর ঠোঁট ফাঁক করে হাঁ-মুখে কয়েক ফোঁটা জল দিতে চেষ্টা করি। এই মুহূর্তে একবার মনে পড়ে যায় আমার মায়ের মুখ। ওঁর প্রতি মনটা কঠিন হয়ে ওঠে।

রামকৃষ্ণ সেবাসদনে এখন এমারজেন্সি ওয়ার্ডে আমার বাবা। ওঁকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঘামছি। চটি ভিজে গেছে পায়ের তলার ঘামে। চট্ চট্ করছে। সুইং ডোর ঠেলে উঁকি মেরে দেখছি, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে পলিথিনের নলের ভেতরে। ওই রক্ত আমার বাবার রক্তের সঙ্গে মিশে যাবে। আমার বাবার রক্তস্রোত আমার শিরায়, ধমনীতে····। আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। ওঁকে যে আমায় বাঁচাতেই হবে। আমার ব্যাগে রাখা টিউশনির টাকা থেকে ট্যাক্সি ভাড়া দিয়েছি। দু-একটা ওষুধও কিনতে হয়েছে। আরো টাকার দরকার। প্রচুর টাকা। কিন্তু আমি কোথায় পাব? অতনু বলেছিল, ওকে আমার দরকার হবে।········অতনুর বাবার অনেক টাকা।····থাক দরকার নেই আমার অতনুর টাকায়····। মাকে কি একটা টেলিফোন করব?····না থাক। আমার বাবাকে ফেলে রেখে মা একদিন····! উনি তো এখন রাহুলবাবার স্ত্রী।

পেসেন্টের পকেটে নাকি একটা পার্স ছিল। তার মধ্যে গোটা দশেক টাকা। সিস্টার আমায় দিয়ে গেল। "রোগীর নাম?" ওরা জিজ্ঞেস করেছিল। বেড্ টিকিটে লিখতে হবে। আমি কেসে গলাটা পরিষ্কার করে বলেছি, "আমার বাবার নাম কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়।"

পিপাসায় আমার গলার ছাতি ফেটে যায়। একটা ডাব খেলে হয়। আমার শাড়ীতেও ছোপ ছোপ রক্ত লেগেছে। এভাবে রাস্তায় বেরোই কি করে? একজন ওয়ার্ড বয় এগিয়ে যাচ্ছিল, আমি তার

কাছে জল চাই। এক গ্লাস নিঃশেষ করি, তারপর আর এক গ্লাস চাই। ওয়ার্ড বয় তাকিয়ে থাকে আমার মুখের দিকে।

জীবনে এত সংকটে কখনও পড়িনি। একজন সিস্টার বোধহয় আসেন এমারজেন্সি ওয়ার্ড থেকে। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, "আমার বাবার অবস্থা কেমন?"

"খুবই সিরিয়াস!"

"বাঁচবেন তো?"

"এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না।"

বেলা গোটা দুয়েকের সময় একজন ডাক্তার "আমায় বলেন, "আপনি ওঁর মেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার নাম রীণা?"

"না তো।"

"উনি বলছেন, "রীণা ওঁর মেয়ে। উনি দেখতে চাইছেন তাঁকে।"

তবে কি? তবে কি আমার বাবা আবার বিয়ে করেছেন? আমাকে ওঁর প্রয়োজন নেই? প্রয়োজন রীণাকে? আমি অভিমানে মরে যাই। অচেনা কোন্ এক রীণার ওপরে ভারি হিংসা হয়।

ডাক্তার আবার বলেন, "উনি ওঁর বাড়ির ঠিকানা বলতে পারছেন। বলছেন, ওঁর স্ত্রীকে খবর দিতে। আমি বলেছি, আপনার মেয়ে এসেছে। উনি দেখতে চাইছেন।"

"ওঁর বাড়ির ঠিকানা উনি কি বলছেন?"

"সতেরর এক কাঁকুলিয়া রোড।"

উনি কি তবে বেনারসে থাকেন না? মা তো সেদিনও বললেন····।

আমার বুক কাঁপে উত্তেজনায়। উনি কি চিনতে পারবেন আমায়? চার বছর বয়েসের রূপসির মুখের ওপর আজ যে অন্য এক মেয়ের মুখ বসানো। যৌবন আমার মুখ বদলে দিয়েছে। শরীরের গড়ন বদলে দিয়েছে বদলে দিয়েছে। আমার কণ্ঠস্বর। হায়! আজ

যদি আমি সেই গলার স্বর ফিরে পেতাম! সেই মুখ, সেই ছোট্ট মানুষের দেহ। যাকে দেখলেই আমার বাবা চিনতে পারতেন !

আমার চোখ, আমার কপাল, মুখের আদল নাকি অনেকটা আমার বাবার মত। মায়ের কাছে শুনেছি কতবার। কিছুই কি ওঁর মনে হবে না আমায় দেখে ? আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উনি যখন প্রশ্ন করবেন, "তোমায় তো চিনি না। তুমি কে ?" তখন আমি আমার নাম বলব। বলব, "আমি তোমার সেই ছোট্ট রূপ্সি।" কথাগুলো বার বার মনের মধ্যে সাজিয়ে নিই। অদ্ভুত তৃপ্তি পাই। মনটা যেন হাল্কা হয়ে যায়। যে বাবাকে আমি এতদিন খুঁজেছি, আজ তাঁর সামনে আমার ইন্টারভিউ।

এমারজেন্সি ওয়ার্ডের দুধের মত সাদা পর্দাটা তুলে আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই বাবার দিকে। হাতের শিরার মধ্যে এখনো ইঞ্জেকশনের ছুঁচ ফোটানো। একটু একটু করে রক্ত যাচ্ছে ওঁর শরীরে। ওঁর চোখ দুটো এলোমেলো, খুঁজছে যেন কাকে। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি বলেন, "কে ?"

"আমি, আমি রূপ্সি। আমার গলার স্বর কেঁপে যায়।

"রূপ্সি বলে তো আমি কাউকে চিনি না।"

আমি বুঝতে পারি না উনি কি ইচ্ছে করেই আমায় না চেনার ভান করছেন ? দারুণ অভিমান হয়। ভাবি, এখান থেকে পালিয়ে যাই। কিন্তু না। আমি যে আজ সমস্ত কিছু ফয়সালা করতে চাই। "আমায় চিনতে পারছেন না ?" আমার গলার স্বর ব্যাকুল হয়। যদিও আমি যথেষ্ট চেষ্টা করি নিজেকে সংযত রাখতে।

অদ্ভুত চোখে আমায় দেখতে থাকেন ডাক্তার-নার্সরা।

আমার বাবা বলেন "না।"

"আপনি আর ওকে ডিসটার্ব করবেন না।" ডাক্তার বলেন।

আমি চলে যাবার জন্যে পা বাড়াই। কয়েক পা এগিয়ে ফের থমকে দাঁড়াই। বাবার কাছে গিয়ে বলি, "আচ্ছা, আপনার নাম

কি বললেন ? আপনার নাম কি কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ?”

“না তো। আমার নাম সুশোভন মিত্র।”

“সেকি !” আমি চমকে উঠি, বলি, “কিছু মনে করবেন না। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আপনাকে আমার বাবা ভেবেছিলাম।”

“বাবা ?” হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকেন ভদ্রলোক।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে ডাক্তার বলেন, “আপনি আপনার বাবাকে চেনেন না ?”

সিস্টার বলেন, “আপনার বাবা বুঝি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন ? অনেক বছর আগে ?”

“হ্যাঁ, আচ্ছা চলি।” আমি বড় পায়ে এগিয়ে যাই দরজার দিকে। নইলে আরো হাজারটা প্রশ্ন আমায় গিলে খাবে।

মাথার মধ্যে ঘূর্ণি ঝড় চলতে থাকে। এই লোকটা বাবা নয়। অথচ এঁর জন্যে আমার আজ ট্যাক্সিভাড়া আর ওষুধপত্র নিয়ে প্রায় গোটা পঞ্চাশেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের জ্ঞান ফিরতে দেরী হ'লে আরো কিছু যেত। ব্লাডব্যাঙ্ক থেকে রক্ত নেওয়া হচ্ছে। এর টাকাটাও তো দিতে হতো।

“শুনুন।” নার্স ডাকেন।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ি।

“উনি ওঁর বাড়ির ঠিকানা বলেছেন। টেলিফোন নম্বরও দিয়েছেন। আমরা এখুনি খবর দিচ্ছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।”

“তাতে আমার কি হবে ?” আমি হতাশ গলায় বলি।

সিস্টার বলেন, “ওঁর জন্যে আপনার যে টাকাগুলো খরচা হল, সেগুলো ওঁরা এলে দিয়ে দেবেন।”

“ধন্যবাদ। দরকার নেই।” আমি দ্রুত হেঁটে যাই।

হাসপাতালের আউটডোরে কাতারে কাতারে মানুষ। কৌতূহলী চোখে ওরা দেখে আমায়। আমার সারা কাপড়ে রক্তের ছোপ।

কোনরকমে বেরিয়ে যাই গেট দিয়ে। "ট্যাক্সি!" হাত নেড়ে ইশারায় ডাকি। সন্থ ভাড়া বেড়েছে ট্যাক্সির। নতুন মিটার চালু হয়েছে। অনেকেই বয়কট করেছে ট্যাক্সিকে। প্রচুর খালি ট্যাক্সি এদিক-ওদিক থেমে আছে। আমার সংকেতে ছুটে আসে একসঙ্গে দুটো। আমি বলি, "আমার তো একটাই প্রয়োজন। দুটো নয়।"

দুই ট্যাক্সিওয়ালার মধ্যে তর্কাতর্কি বেধে যায়। কে সওয়ারীকে তুলবে। ওদের ঝগড়ার মধ্যেই আমি একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে বসি। অন্য ট্যাক্সিওয়ালা বাজে একটা খিস্তি ছোড়ে। আমি সেসব গ্রাহ্য না করে বলি, "ভবানীপুর।"

ট্যাক্সির স্টার্ট, ইঞ্জিনের গুঞ্জনে অন্যমনস্ক হয়ে পেছন ফিরি। দেখি, এমারজেন্সি ওয়ার্ডের সিস্টার ছুটে আসছেন। ট্যাক্সিওয়ালাকে থামতে বলি।

সিস্টার কাছে এসে বলেন, "পেসেণ্ট আপনার ঠিকানা চাইছেন। ডক্টর বলছেন, আপনাকে পরে একবার আসতে। ব্যাপারটা ভেরিফাই করা যাবে। পেসেণ্ট এখন হয়ত প্রকৃতিস্থ নেই।"

"আমার পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব হবে না। পেসেণ্ট ঠিকই বলেছেন। উনি সত্যিই আমার বাবা নন।"

"ওঁর জন্যে এতগুলো টাকা আপনি শুধু খরচই বা করবেন কেন?" ওঁর বাড়ির লোক যাতে টাকাগুলো দেয় আমরা তার ব্যবস্থা করব।"

"আপনারা যে আমার ওপর এতটা সহানুভূতি দেখালেন, সেজন্যেই ধন্যবাদ। ওঁর জন্যে আমি যেটুকু খরচ করেছি সেটুকু করা আমার কর্তব্য ছিল। আমি যে ওঁকে আমার বাবা ভেবেছিলাম।"

কথা বলতে বলতে আমার গলা ধরে যায়। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন সিস্টার।

বাড়ি ফিরতেই মা আঁতকে ওঠেন, "কি হয়েছে তোমার?"

আমি কোন জবাব দিই না। সোজা নিজের ঘরে চলে যাই। টুপ্সি তখন স্কুলে চলে গেছে। রাহুলবাবাও অফিসে।

আলনা থেকে ধোওয়া কাপড়-চোপড় হাতে করে আমি বাথরুমে চলে যাই। একনজরে তাকাই মায়ের দিকে। উনি ভীত চোখে দেখছেন আমায়।

সাবান মেখে বেশ খানিকটা জল গায়ে ঢেলেও যেন আমি স্বস্তি পাই না। মনে হয়, আমার গায়ে এখনো প্রচুর রক্ত লেগে আছে। টাটকা রক্ত। একজন জীবন্ত মানুষের রক্ত। এই রক্ত আমার বাবার রক্ত নয়। আমার রক্ত নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনাত্মীয় এক মানুষের রক্ত সারা শরীরে মেখে আমি যেন জল্লাদ হয়েছি! আমি কি দুর্ঘটনা ঘটিয়েছি ওঁর? কাল থেকে আমার অচেতন মন হয়ত ভেবে চলেছিল ওঁকে।

"তোমার গায়ে এত রক্ত লেগেছিল কেন?" আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সাহস করে প্রশ্ন করেন মা।

আমি কোন উত্তর দিই না। শুধু বলি, "আমার বাবার ঠিকানাটা বলবে?"

"তোমার বাবা!" ভয় পাওয়া চোখে মা বলেন, "কেন?"

"আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

মার চোখ দুটো কঠিন হয়ে ওঠে। বলেন, "না। মানুষটাকে আমি ঘৃণা করি। ওঁর কাছে তুমি কোনদিন যেও না রূপসি।"

"উনি আমার বাবা। ওঁর কাছে আমায় যেতেই হবে। এই নরককুণ্ডে আমি পচে মরতে পারব না।"

"নরককুণ্ড!" মা বিড়বিড় করেন। বাজির ফুলকির মত ওর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। উনি বলেন, "তোমার মত বেইমান না হ'লে আর এ কথা কে বলবে?"

"আমি বেইমান?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।" মা উত্তেজিতভাবে বলেন, "তোমার জন্যে, শুধু তোমার জন্যেই আমায় বাঁচতে হয়েছিল। বাঁচবার কথা চিন্তা করতে হয়েছিল।"

জানালার গায়ে মাথা রেখে মা হাঁপাতে থাকেন।

আমার ভেতরকার ক্লান্ত, অভুক্ত মানুষটা বলে ওঠে, "বাঁচবার কি সুন্দর উপায়। আর একজনকে বিয়ে করে নতুন সংসার সাজিয়ে আমায় পথে বসানো!"

"চুপ কর। তুমি কি বলছ, রূপ্‌সি?"

"আমি ঠিকই বলছি। বলো, বলো, চুপ করে থেকো না। ওঁর ঠিকানা লুকোতে চেষ্টা করো না!" আমিও হাঁপাতে থাকি।

"বেশ তবে শোনো। ২৯/১, বাবুবাগান লেন।"

"ঢাকুরিয়া?"

"হ্যাঁ।"

আমি দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন না করে বেরিয়ে যাই ঘর থেকে।

নেমপ্লেটে বাবার নাম লেখা। কোন ভুল নেই। আমি আমার বাবার বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেছি, একটা কলিং বেল রয়েছে দরজার গায়ে। আমি জোরে বেল টিপি। অল্পবয়সী একটি মেয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে, "কে?"

"কল্যাণবাবু আছেন?"

"নেই। উনি আফিসে।"

"ক'টায় ফেরেন?"

"গোটা ছয়েকের মধ্যে।"

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা ন'টা বেজে আছে। আজ দম দিতে ভুলে গেছি। মেয়েটিকে বলি, "কটা বাজে বলতে পারো?"

"দাঁড়ান দেখছি। ও ঘড়ি দেখতে চলে যায়।

খানিক বাদে ফিরে আসে। জানালা দিয়ে ফের মুখ বাড়িয়ে বলে, "চারটে।"

"তুমি এখানে কাজ কর?"

"হ্যাঁ।"

আমি হুকুমের ভঙ্গিতে বলি, "দরজাটা খোলো। ভেতরে গিয়ে

একটু বসি।"

"অচেনা লোককে আমার যে দরজা খোলা বারণ।"

"দরজা খুললে উনি আমায় কিছু বলবেন না। খোলো।"

"আপনি কে?"

"খোলো বলছি।" আমার এই মনিব-সুলভ ধমকে মেয়েটি ঘাবড়ে যায়।

"আপনি বুঝি ওনার কেউ হন?" এই বলে মেয়েটি দরজা খোলে।

আমি পাখা খুলে বসি।

আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই। কয়েকটা নাইলন বেতের চেয়ার। একটা সোফা কাম বেড্। ধুলোর পুরু সর জমে আছে ফ্যানের ব্লেডে। সাদা রঙ ধূসর হয়ে এসেছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হচ্ছে। মনে হয়, অনেকদিনের পুরনো ফ্যান। আমার মা যখন এ বাড়িতে ছিলেন, এটা কি তখনকার? হয়ত হবে। অবাক লাগছে, এই বাড়িতেই কেটেছে আমার শিশুবেলার চার চারটে বছর। কোন চিহ্ন নেই তার। দেওয়ালের গায়ে নিদেনপক্ষে আমার একটা ছবি? আমার মায়ের ছবি বলছি না। শুধু আমার? বাইরের ছবির হয়ত দরকার হয়নি। বাবার বুকের মধ্যেই তো আমার ছবি আঁকা। যদি আর কোন সন্তান না হয়ে থাকে। উনি তো বোধহয় আর বিয়ে-ফিয়ে করেননি। "এই শোনো!" আমি কাজের মেয়েটিকে ডাকি।

ও পাশের ঘরে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে একটা বাঁশের কুলোয় করে রেশনের চাল বাচছে। আমার ডাকে ফিরে তাকায়। দু' ঘরের দরজার মধ্যে কোন পর্দা নেই।

"এ বাড়িতে কে কে থাকেন?"

"দাদাবাবু আর আমি। মাসি আসেন সময় সময়।"

"কোন্ মাসি? কার মাসি?"

"দাদাবাবুর মাসি।"

"দাদাবাবুর মাসি ?" আমি অস্ফুটে বলি।

ভারি অদ্ভুত লাগে। আমার বাবার মাসি। এ কথা তো কোনদিন শুনিনি। আমার মা তো আমায় বলেননি, আমার বাবার কোন মাসি-টাসি আছেন।

বৃষ্টি নামে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। আমি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরি। মেয়েটি হাঁ করে আমায় দেখে। "তুমি এ বাড়িতে কতদিন আছো ?" আমি ওকে জিজ্ঞেস করি।

ও বলে "ছ' মাস।"

"তোমার নাম কি ?"

"ময়না।"

আমি বলি, "বাহ্, সুন্দর। তোমার নামটা তো একটা পাখীর নাম।"

ও খুশি হয়।

"ময়না। আমায় এক কাপ চা খাওয়াবে ?"

ও একটু ইতস্ততঃ করে। বলে, "দাদাবাবু এলে········।"

"আমি খেতে চাইলে তোমার দাদাবাবু খুশি হবেন। চা আর কিছু খাবার নিয়ে এসো। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।"

আমার বলার ধরনে ময়না হেসে ফেলে।

"আপনি দাদাবাবুর কে হন ?" ময়না খুব কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

আমি বলি, "সে তোমার দাদাবাবু এলেই বুঝতে পারবে।"

ঠোঁট কেটে ময়না হাসে। আমার ভাল লাগে না ওর হাসিটা। আমি গম্ভীর হয়ে যাই। ময়না বোধহয় ভয় পায়। বলে, "মুড়ি আছে। খাবেন ?"

"মুড়ি আমার খুব প্রিয় জিনিস। নিয়ে এসো। তেল দিয়ে, লঙ্কার কুচি, আদার কুচি, পেঁয়াজ কুচি আর যদি একটু চানাচুর-টুর থাকে, তাই দিয়ে বেশ করে মেখে নিয়ে এসো।"

ময়না হাসে "মশল্লা মুড়ি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

ও চলে যায়।

আবার ডাকি "ময়না। ময়না।"

"বলুন।"

"নেবু আছে।"

"আছে।"

"একটু নেবুর রসও দিয়ো।"

ও মাথা নাড়ে।

সামনেই ঢাকুরিয়া স্টেশন। লোক্যাল ইলেকট্রিক ট্রেনের আসা-যাওয়া চলছে। হুইসেলের শব্দ আমার কানে খিল ধরিয়ে দিচ্ছে। এখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আমি বৃষ্টির একটানা ঝিম্‌ঝিম্, ঝম্‌ঝম্ গান শুনছি। আর আমার বাবার বাড়ির সামনের জল জমা দেখছি। দেখতে দেখতে হাঁটুসমান জল জমে যায়। এ বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। ছাতি মুড়ি দিয়ে একজন বুড়ো ভদ্রলোক আসছেন। কৌতূহলী চোখে একবার উঁকি মারছেন এ বাড়ির জানালায়। আমার মোটেই ভাল লাগে না বুড়োর এই সন্দিগ্ধ চাউনি। আমি মুখ ফিরিয়ে নিই।

একা একা বসে আমি সারাদিনের ঘটনার কথা ভাবি। কোন দিনই বোধহয় ভুলতে পারব না এই দিনটিকে। আজ আমার বাবার সঙ্গে দেখা হবে। একটা স্মরণীয় দিন আমার জীবনে। সেই ছোট-বেলার দেখা আর আজকের দেখা তো এক নয়। হাসপাতালে এমারজেন্সি ওয়ার্ডে ওই ভদ্রলোকের অবস্থা এখন কেমন কে জানে। কাল একবার টেলিফোন করে জেনে নেব।

এভাবে মায়া বাড়িয়ে কি হবে তাও তো বুঝি না। ভদ্রলোক যদি এ যাত্রায় বেঁচে যান, তাহলে হয়ত আমার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বলবেন, "বাবা ভেবে যাকে ভুল করেছিলে, তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখো.

না মা।" ওঁর স্ত্রী হয়ত বলবেন, "তোমায় যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব।" আমার ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে।

এ মাসটা বেশ কষ্ট করে চলবে। টিউশনির অনেকগুলো টাকাই খরচা হয়ে গেল। তা যাক্। কোন মহৎ কাজ করার সৌভাগ্যও তো কম নয়। কপাল ভাল থাকলে যদি বাবার সঙ্গে ভাবটাব হয়ে যায়, তবে জমিয়ে এই গল্পটা বলব বাবাকে।

ময়না চা আর মুড়িমাখা নিয়ে আসে।

বাইরে বৃষ্টি। মেঘলা আকাশ। মনটা যেন কেমন উদাস হয়ে যায়। বাবা কি বুঝবেন আমায়? মনে হচ্ছে, বাড়িটা বেশ বড়সড়। একখানা ঘরে বাবা যদি থাকতে দেন আমায়।

মুড়িমাখা চিবোতে চিবোতে বলি, "তোর দাদাবাবু অফিস থেকে ফিরে কি খান্ রে ময়না?"

ময়না বলে, "কিছু ঠিক নেই। লুচি, পরোটা, রুটি, মুড়ি, চিড়ে ভাজা—যেদিন যেমন ইচ্ছে হয়।"

"উনি বিয়ে করেন নি—না?" আমি কিছুই যেন জানি না এমন ভাব করে ময়নাকে জিজ্ঞেস করি।

ও বলে, "করেছেন। শুনেছি বাবুর বউ, মেয়ে আছে।"

"তাঁরা কোথায়?"

"বউটা হারামি, পাইলেছে কার সঙ্গে যেন।"

ময়নার এই কথায় আমার মন জ্বলে ওঠে। আমার মায়ের সম্বন্ধে বাড়ীর কাজের লোকের মুখে এই কটূক্তি অসহ্য লাগে। তবু মনের কথা গোপন রেখে বলি, "তোকে কে বললো?"

"মাসিমা।"

"মাসিমা!" বাবার সেই মাসি?

ময়না মাথা নাড়ে।

আমার খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে একজনকে, যিনি ছোটবেলায় মাঝে

মাঝে এসে থাকতেন। উনি এলেই মায়ের সঙ্গে বাবার গোলমাল হত।

আমার হাতের চা জুড়োতে থাকে। খাওয়া হয় না। আমি অপলকে তাকিয়ে থাকি সিলিং-এর পাখাটাব দিকে। ময়না বলে, "চা-টা খান! ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

আমি আচমকা ফিরে তাকাই ওর দিকে। বলি, "হ্যাঁ খাচ্ছি।"

ঘুরে ঘুরে দেখছি বাড়িটা। যদি ছোটবেলার কোন স্মৃতি মনে পড়ে। আমার সঙ্গে সঙ্গে ময়নাও ঘোরে। ও গাইডের মত বলে যায়, "এটা শোবার ঘর, এই ঘরে বাবু পড়াশুনো, অফিসের কাজটাজ করেন। এই ঘরে খাওয়া-দাওয়া হয়। এ ঘরটা অতিথি-টতিথিদের জন্যে।"

আমি তাড়াতাড়ি বলি, "বাবার মাসি এলে বুঝি এ ঘরে থাকেন?"

ময়না হাসি আড়াল করে বলে, 'হ্যাঁ।'

আমি ওর এই হাসির অর্থ বুঝি না।

ছেলেবেলার কোন চিহ্নই তো আমার মনে পড়ে না। আমাব স্মৃতিশক্তি এত কম কেন?

ময়না বলে, "এটা ইস্টোর রুম। আজেবাজে জিনিস থাকে।"

অন্ধকার খুপরির মত একটা ছোট্ট ঘরের সামনে ময়না থমকে দাঁড়ায়। তারপর আবার চলতে থাকে। আমি উঁকি মেরে দেখি ঘরের মধ্যে। অনেক দিনের পুরনো ধুলোব ভ্যাপ্‌সা গন্ধ আমার নাকে আসে। ভাঙ্গা ঝুড়ি, হাতলভাঙ্গা ইজিচেয়ার, পুরন ট্র্যাঙ্ক, কাঠের বাক্সের ডাঁই করা স্তূপের মধ্যে আমার চোখে পড়ে যায় রং চটা লালরঙের একটা ট্রাই সাইকেল। বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে। অজানা একটা আনন্দের ঢেউ খেলে যায় আমার বুকের মধ্যে। আবছা মনে পড়ে, আমার একটা সাইকেল ছিল। সেই সাইকেল চড়ে আমি সারা বাড়ি ঘুট্‌ঘুট্‌ করে বেড়াতাম। ওই ওই তো সেই পাঁচিল ঘেরা ছোট্ট উঠোন। বারান্দার ওপর থেকে সাইকেল নিয়ে আমি হুড়মুড় করে পড়ে যাই একদিন উঠোনে। থুত্‌নির নীচে কাটা দাগটা এখনো

আছে। আমি পরম মমতায় হাত বুলোই। থুতনীর নীচে। আর কিছু মনে পড়ে না।

"ওই সাইকেলটা কার রে ময়না?"

ময়না বলে, "বাবুর মেয়ের। দাদাবাবুর মেয়ে যখন এখানে ছিল, তখন সে চালাত ওই সাইকেল।"

আমি সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকি সাইকেলটার দিকে। এ বাড়িতে আমার অস্তিত্বের ওই একটিমাত্র চিহ্ন। আমি একদিন ছিলাম!

"ময়না! ওই সাইকেলটা ওখানে পুঁজি করে জঞ্জাল না বাড়িয়ে তোর বাবুকে বিক্রী করে দিতে বলিস!"

ময়না সরল চোখে তাকায়। বলে, "বলেছিলাম। পুরনো খবরের কাগজওলা কিনতেও চেয়েছিল, তা দাদাবাবু রাজী হন নি।"

আমার চোখ ছলছল করে। ময়না জানে না, সে আমায় কোন্ আশ্চর্য খবর শোনাল। আমার বাবার কাছে আমার স্মৃতির দাম আছে। পুরনো স্মৃতি আগলে রেখে দুঃখ পেতে ভালবাসেন আমার বাবা? কেন এতদিন খোঁজ করেন নি আমার? আমার গলার মধ্যে একরাশ জমাট কান্না। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। বাবার শোবার ঘরে, আমার বাবার মাথার বালিশে মুখ গুঁজে আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি। ময়না কিছু বোঝে না।

ও বলে, "এখানে শুয়ে পড়লেন দিদি? আপনার শরীর খারাপ?"

আমি কোন কথা বলি না। অবুঝ ময়না আমার চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, "দাদাবাবুর বিছানায় শোবেন না দিদি। উনি রাগ করবেন।"

তবু আমি উঠি না।

টুপ্‌সি যেমন ওর বাবার বিছানায় বসে পুতুল খেলে, ওর বাবার বুকে মাথা রেখে বায়না ধরে, আমিও কি ছেলেবেলায় তাই করেছি আমার বাবার সঙ্গে? আমি আমার বাবার বালিশে বাবার মাথার চুলের তেলের গন্ধ শুঁকি। আমার বয়েস ভুলে যাই। ভুলে যাই

বাবার সঙ্গে আমার আজকের ফারাক।

ফুরিয়ে আসে বৃষ্টিভেজা বিকেল। ঝুপ করে সন্ধ্যে নেমে পড়ে। আমি খুব ক্লান্তি বোধ করি। ভাবি, যদি এইখানেই কেটে যায়, আমার জীবনের বাকী সময়! তাহলে আমায় আর জায়গা খুঁজে বেড়াতে হয় না। আমার থাকবার জায়গা। একটা নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়। তারপরই ভাবি, যে ঠিকানায় থেকে আমার মা স্বস্তি পান নি, সেই ঠিকানা আমায় কি দেবে? কিন্তু উনি তো স্ত্রী ছিলেন। আর আমি যে মেয়ে। ওঁর রক্তে আমার জন্ম। উনি আমার পিতা। আমার প্রতিপালক। প্রতিপালকের দায়িত্বের কথা উনি কি ভাবেন নি আমার জন্মলগ্নে?

"দিদি! দিদি! উঠুন। দাদাবাবু এসেছেন।" ময়না আমায় ডাকে।

আমি ধড়ফড় করে উঠে বসি। বলি, "কোথায়?"

ময়না বলে, "বাইরের ঘরে।"

শাড়ীর আঁচলটা গুছিয়ে নিয়ে, আমার রুখু চুলগুলো তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে সমান করে আমি বাইরের ঘরের দিকে যাই। ভেবেছিলাম, চোখের জলের ভেতর দিয়ে আমার পরিচয় হবে বাবার সঙ্গে। কিন্তু তা হয় না। আমি শুকনো চোখে অপলকে তাকাই। ভিজে জবজব করছে আমার বাবার গায়ের বর্ষাতি। মাথার ভিজে টুপি থেকে জল ঝরছে। উনি আমায় চিনতে পারেন না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকান। অপরিচিতা এক যুবতীর সঙ্গে যে ভদ্রতার হাসি হাসতে হয়, তেমনি মৃদু হেসে বলেন, "আপনাকে তো ঠিক........"

আমার গলাই বা এত কাঠ কাঠ শোনায় কেন? আমি আমার গুছান কথাগুলো ভুলে যাই। বলতে পারি না "আমি রূপসি। আমি তোমার সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছি বাবা!" আমি শুধু বলি, "আমার মায়ের নাম সোহিনী।"

"কে!" বাবা চমকে ওঠেন।

আমি মুখে হাসি টানতে চেষ্টা করি, "অনেক দিন থেকেই আসব

আসব ভাবছিলাম !”

ওঁর মুখে হাসি ফোটে না তবু। উনি অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলেন, “তা আজই বা কি মনে করে ?”

“এই এলাম আর কি ?”

“টাকা পয়সা কিন্তু আমি দিতে-টিতে পারব না ।”

এই কি আমার বাবা ? আমার মনের পুতুলটা ঝনঝন করে ভেঙ্গে যায়। আমি এই বাবার জন্যে মাকে অপমান করে এতটা পথ ছুটে এসেছি ? তীর-খাওয়া হরিণের মত আমি ফিরে তাকাই । কোন কথা না বলে বাবা পাশের ঘরে চলে যান ।

ময়না দাঁড়িয়ে দেখে আমায়। ওর ব্যথাতুর দৃষ্টি আমার মন ছুঁয়ে যায়। ও আমায় বলে, “আপনি দাদাবাবুর কে হন দিদি ?”

আমি কিছু বলি না। সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে মরুভূমির ক্যালেণ্ডার দেখি। ধূ ধূ করে শুধু বালিয়ারী। পথহারা পথিকের মত আমি শুধু রাস্তা খুঁজি। পাই না। আমি ভেঙ্গেচুরে আমার মনের মধ্যে আর এক বাবাকে সাজাই। সেই বাবাকে সেলাম ঠুকে বলি, “তোমার সঙ্গে আমার আজ এখানেই ইতি ।”

চলে আসছিলাম ।

“দাঁড়াও ।”

বাবার গলার স্বরে ফিরে তাকাই ।

“এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে যাবে নাকি ? জলটা একটু ধরুক ।”

এই বাবাকে কি বলব বুঝতে পারি না। আপনি না তুমি ? আমি হালকা চালে বলি, “আপনার এই সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ ।”

“কি, কি বললে ?” রূঢ় গলায় বাবা বলেন ।

ধীরে ধীরে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কথাটা আবার উচ্চারণ করি । বাবা যেন পাথর হয়ে যান। কিছুক্ষণ ওঁর মুখ থেকে কোন কথাই সরে না ।

তারপর ঘোর কেটে গেলে বলেন, “তোমার মা তোমায় ভালই শিক্ষা দিয়েছে ।”

আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারি না।

বলি, "আপনি তাহলে কিছু শিক্ষা দিন।"

কথাটা বলেই আমি উত্তরের অপেক্ষা করি। ভাবি, এবার বোধহয় বোমা ফাটবে কিন্তু কিছুই হয় না।

তোয়ালে দিয়ে গায়ের জল মুছতে মুছতে বাবা বলেন, "শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ তোমার মা আমায় দেয় নি।"

"অজুহাত দেখিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবেন না।"

"তুমি কৈফিয়ত চাইতে এসেছ?" বাবার গলা উত্তপ্ত শোনায়।

আমি বলি, "হ্যাঁ। কোন্ অপরাধে তুমি আমার মাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে জানি না। কিন্তু আমার ওপবে কি তোমাব কোন কর্তব্য ছিল না?"

বাবার চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়। আমার চোখের ভেতরে উনি যেন কি খোঁজেন। বাইরের বৃষ্টির শব্দ, ঘরের স্তব্ধতা সব মিলে কেমন একটা অদ্ভুত পরিবেশ তৈরী হয়। বাবা বলেন, "তোমার মা তোমার ওপর থেকে অধিকার ছেড়ে দিলেই আমি কর্তব্যের কথাটা ভাবতে পারতাম।"

"আমার মা অধিকার ছেড়ে দেবে কেন?"

ময়না চা এনে দেয়। উনি চায়ের কাপে চুমুক মেরে বলেন, "তোমার মায়ের অশালীন জীবন-যাত্রা, স্বভাব-চরিত্র যা আমার পছন্দ ছিল না। সেই মায়েব কাছে আমার মেয়ে মানুষ হোক এও আমি চাই নি।"

মায়ের নামে এই অভিযোগ সত্যি হোক আর মিথ্যেই হোক আমি সইতে পারি না। বলি, "এখন আমায় দেখে কি মনে হচ্ছে? মায়ের আদর্শের পুরোপুরি ছাপ? না-কি তোমার........।"

"তুমি আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলবে না!" উনি চড়া গলায় বলেন।

আমি দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দু কনুইতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে

থাকি। উনি বলতে থাকেন, "তোমার মা তোমায় তারই মত একটি অসভ্য তৈরী করেছে।"

"অসভ্য!"

আমি চমকে উঠি। কিছুক্ষণ মুখ থেকে কোন কথাই সরে না আমার। তারপর কেটে কেটে বলি, "আমিও কিন্তু আমার বাবার খুব একটা সভ্য মনের পরিচয় পাচ্ছি না।"

"বাবার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তুমি জানো না?"

মেয়ের সঙ্গে কথা বলার তোমার এই কি নমুনা?

"বেরিয়ে যাও। তুমি আর কখনও আসবে না।"

আমার জেদ বেড়ে যায়। আমি ওঁকে অগ্রাহ্য করে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ি। বাইরে বৃষ্টির জলধারা। আমার শরীর ভেঙ্গে আসে। সারাদিনের অনিয়ম, চিন্তা, ভাবনা, অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। আমি বুঝতে পারি না আজ রাতে আমার জায়গা কোথায়?

আমায় বসে পড়তে দেখে কল্যাণ চ্যাটার্জী নামের ওই ভদ্রলোক যিনি আমার বাবা, তিনি বোধহয় একটু ঘাবড়েই যান। আমায় কটাক্ষ করে উনি চলে যান ভেতরের ঘরে।

খানিক বাদে ময়না এসে বলে, "দাদাবাবু ডাকছেন আপনাকে।"

আমি তবুও উঠি না। বসেই থাকি।

এতদিন আমার মনের মধ্যে ছিল আমার বাবার একটা অস্পষ্ট অবয়ব। সেই মানুষটার প্রতি আমার যে মোহ ছিল, আজ বাস্তবে তার মুখোমুখি হয়ে আমার সেই মোহ ভঙ্গ হল। তবু জানি না কেন যাই-যাই করেও এই মানুষটাকে উপেক্ষা করে চলে যেতে পারি না। আমি ওঁর এই রূঢ় ব্যবহারের কারণ খুঁজি। টুপসি যত দোষই করুক, রাহুলবাবার কাছে তার ক্ষমা থাকে। আমি চোখ বুজে ওদের বাবা-মেয়ের মিলনের দৃশ্যটা উপভোগ করি। আমি যেন ওদের কেউ নই। ওদের সঙ্গে যুক্ত নই, আমি যেন এক শিল্পী যে তার ক্যানভাসে পিতা-

পুত্রীর সার্থক মিলনের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে চায় ওদের দু-জনকে সামনে রেখে।

আমি খুট করে দরজা খুলি। বাইরে সমানে জল ঝরছে, আমি বেরিয়ে যাই।

ময়না ডাকে, "দিদি! দাদাবাবু বলছেন আজকের রাতটা দরকার হলে থাকতে পারেন।"

"দরকার নেই। তোর দাদাবাবুকে বলিস।"

"অন্ততঃ একটা ছাতা যদি নিয়ে যান।" ময়না ইতস্ততঃ করে বলে, "তারও দরকার নেই।"

আমি শাড়ীর আঁচলে মাথা ঢেকে ওই বৃষ্টির মধ্যেই বাস স্টপের দিকে এগোই। হাঁটুসমান জল দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তায়। রাত হয়েছে। লোকজন বিশেষ নেই। অফিসফেরত কয়েকজন মহিলা-পুরুষ ভিজতে ভিজতে আসছেন। আমিও হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে ওঁদের মতই জুতো হাতে করে সাবধানে পা ফেলি। বুঝতে পারি না আমার এই চলা আজ রাতে কোথায় গিয়ে থামবে। দু-একজন বলতে বলতে যাচ্ছে, বাস-ট্রাম নাকি বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার মাথাটা ভার ভার লাগছে। হাঁচি দিই বারকয়েক। চোখের মধ্যে গরম গরম ভাব। জ্বর হলে যেমন লাগে। ব্যাগের মধ্যে বোধ হয় একটা নোভালজিন রয়েছে। এক গ্লাস জল পেলে হত। রাস্তার দু-ধারের বাড়িগুলোর দরজা-জানালা বন্ধ। নর্দমার নোংরা জলের ঘূর্ণিস্রোত বয়ে যায় রাস্তায়। আমার পা দুটো প্রায় অবশ হয়ে আসে জলের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে।

বাস স্টপে এসে দেখি ব্রেক ডাউন হয়ে পড়ে আছে একটি ডবল ডেকার। গড়িয়াহাট ব্রিজের ওপারে প্রচুর জল থাকায় বাসফাস আসতে পারছে না। ফলে এদিকের বাসও যেতে পারছে না। তবে আশার কথা, দু-একটা মিনি বাস নাকি আসা-যাওয়া করছে। কিন্তু বাস স্ট্যাণ্ডে মেলার মত মানুষ। সবাই দাঁড়িয়ে আছেন বাসের

অপেক্ষায়। আমার শরীরের এমন অবস্থা, আমি বুঝতে পারি না যুদ্ধ করে বাসে ওঠা আমার পক্ষে আজ সম্ভব হবে কি না।

একটা ওষুধের দোকান খোলা রয়েছে দেখে আমি এগিয়ে যাই। কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটিকে বলি, "একগ্লাস জল দিতে পারেন।"

"খাবেন ?"

"হ্যাঁ।"

ছেলেটি কুঁজো থেকে জল গড়াতে গিয়ে দেখে কুঁজো খালি। সে লজ্জিতভাবে বলে, "জল নেই দিদি।"

"ঠিক আছে ভাই।"

আমি ওষুধের দোকানের বেঞ্চে বসে পড়ি।

"ছেলেটি দোকান বন্ধ করে চলে যাবে। ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি বোঝে জানি না। বলে, "আপনি ওই পেট্রোল পাম্পটায় গিয়ে বসতে পারেন, যদি বসার প্রয়োজন হয়। আমায় তো দোকান বন্ধ করতে হবে। দশটা বাজে।"

আমি উঠে পড়ি। গড়িয়াহাট ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকি। সাউদার্ণ পার্কে জল। আজ রাতটা আমার কোথায় কাটবে ভগবান জানেন। আলোটালোও জ্বলছে না কোথাও। এরই মধ্যে লোড শেডিং। রাস্তায় পথচারীর অভাব নেই। জোনাকীর মত দু-তিনটে টর্চের আলো ছোটাছুটি করছে এদিক-সেদিক। ঠুনঠুন ঘণ্টা বাজিয়ে দু-একটা টানা রিক্সও ছুটছে। আমি ব্রিজের ফুটপাথ ধরে হাঁটছি। বৃষ্টির বেগটা একটু থেমেছে। আমার পা আর চলতে চাইছে না। ভিজে কাপড়ে আটকে যাচ্ছি।

উল্টোদিক থেকে একটা রিক্স আসছে। সেই রিক্স থেকে একটা টর্চের আলো গোল হয়ে ঘুরতে থাকে আমার মুখের ওপরে। "কে ?"

আমি ভয় পেয়ে দু'পা পিছোই। রিক্সটা থেমে যায়। ঈশ্বরের দূতের মত অতনু নেমে আসে সেই রিক্স থেকে। আশ্চর্য! এখন আর অতনুকে দেখে আমার রাগ হয় না। আমার মুখে হাসি ফোটে। বলি,

"তুমি ?"

অতনু বলে, "আমার তো এই দিকেই বাড়ি।"

তাই তো ! এ কথাটাও আমার মাথায় এতক্ষণ আসেনি। এই তো ঢাকুরিয়া স্টেশন রোডেই তো অতনুর বাড়ি।

অতনু বলে, "এত রাতে তুমি এদিকে কোথায় গেছিলে ?"

আমি একটু চুপ করে থেকে বলি, "ওই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মোলাকাত করতে।" আমার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে।

অতনু কিছু বুঝতে পারে না। বোঝার চেষ্টাও করে না। শুধু বলে, "আর একটু তাড়াতাড়ি তোমার ফেরা উচিত ছিল। এখন তুমি বাড়ি ফিরবে কি করে ? ওদিকে তো সব বন্ধ হয়ে গেছে। ভবানীপুরের দিকে কোন বাস-টাস চলছে না। আমি যতদূর জানি। লেক মার্কেটে তো জল।"

আমি আর দাঁড়াতে পারি না। পা দুটো টলতে থাকে। মনে হয়, এখানেই পড়ে যাব বোধহয়। আমি তাড়াতাড়ি অতনুর কাঁধ ধরে ফেলি। ওর গায়ে আমার হাত পড়তেই অতনু চমকে ওঠে। বলে, "একি ! জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ভিজেপুড়েও তো ভ্যাপসা হয়েছ দেখছি। ওঠো, ওঠো, এই রিক্সাটায় উঠে পড়।"

কোন আপত্তি না করে আমি উঠে পড়ি রিক্সায়। আমার পাশে বসে অতনু। অতনু রিক্সওয়ালাকে বলে, "গাড়িয়াহাটের দিকে ফিরে চল।"

সারাদিনের যুদ্ধের পর আমি যেন আমার তাঁবুতে ফিরে আসি ! অতনুর কাঁধে মাথা রেখে আমি শান্ত মেয়ের মত চোখ বুজি।

কোন্ রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে রিক্স যায় বুঝতে পারি না। শুধু বুঝি গড়িয়াহাট চলে গেছে অনেকক্ষণ। জ্বরে গা পুড়ে যায়। আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ অতনু ?"

"ভবানীপুরে। তোমাদের বাড়িতে।"

"আমার তো কোন বাড়ি নেই অতনু।"

ও কিছু বুঝতে পারে না। বলে, "এই শরীর খারাপ নিয়ে তোমার বেরুনো ঠিক হয়নি।"

"আমায় অন্য কোথাও নিয়ে চল তুমি।"

আমার দুর্বল গলার স্বরে অতনু হাসে। বলে, "কোথায় নিয়ে যাবো ? তুমি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বক্ছ ?"

আমি চুপ করে থাকি। ওকে বলতে পারি না এ আমার প্রলাপ নয়।

ও বলে, "মাসিমা হয়ত চিন্তা করছেন তোমার জন্য।"

"আমার মা ! আমি ব্যঙ্গের হাসি হাসি। আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। গরম জল।"

অতনু অবাক হয়। "তোমার কি হয়েছে রূপ্সি ?"

ওর গলায় আন্তরিকতা টের পাই। আমি কোন কথা বলি না।

"এই রিক্স, দাঁড়াও এইখানে।"

আমার হাত ধরে সাবধানে নামায় অতনু। আমায় ধরে ধরে ও নিয়ে যায় বারান্দায়। ওর কাঁধে মাথা রেখে আমি টলতে থাকি। অতনু বেল বাজায়। কর্কশ সুরেই বেজে ওঠে বেলটা।

"কে ? কে ?" রাহুলবাবার গলার আওয়াজ আসে।

"খুলুন। খুলুন। আমি অতনু।"

দরজা খুলে যায়। রাহুলবাবা দেখেন অতনুর কাঁধে মাথা রেখে আমি টলছি। দৃশ্যটা শোভন না অশোভন এ জ্ঞান আমার তখন নেই। উনি কিছু বলার আগেই অতনু তাড়াতাড়ি বলে, "রূপসির খুব জ্বর মেসোমশাই। ওকে শুইয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।"

"তুমি কোথায় গেছিলে ওকে নিয়ে ?" রাহুলবাবার কুটিল কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে।

"আমি কোথাও নিয়ে যাইনি। ওর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল রাস্তায়।" অতনুর গলা সপ্রতিভ।

রাহুলবাবা চড়া গলায় বলেন, "এই রাত বারোটার সময় তোমার ওর সঙ্গে দেখা হল রাস্তায় ?"

উনি অতনুর গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেন।

"আপনি আমায় মারলেন ? অতনু বিস্ময়ে হতবাক।"

আমি আমার জ্বোরো লাল চোখদুটো খুলে রাহুলবাবাকে একটু দেখি। অতনুর দিকে তাকিয়ে বলি, "তুমি ফিরে যাও অতনু। কিছু মনে কর না। আমার উপকার করে তুমি আজ দারুণ পুরস্কার পেলে। যদি কাল ভাল থাকি, তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

কথাগুলো বলেই আমি নড়বড়ে পায়ে রাহুলবাবার পাশ কাটিয়ে চলে যাই।

"তুমি কোথায় চললে ?" রাহুলবাবার গলার আওয়াজ শুনতে পাই।

"কথাটা কি আমায় বললেন ? আমি ফিরে তাকাই।"

"যার সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলে, তার সঙ্গেই চলে যাও। এ বাড়িতে থাকা তোমাব হবে না।"

"মেসোমশাই! আপনি কি মানুষ ? ওব গায়ে এত জ্বর……!" অতনুর কথা ভেসে আসে।

"তুমি এখনো দাঁড়িয়ে ? গেট আউট, গেট আউট!" রাহুলবাবা চেঁচিয়ে বলেন অতনুকে।

অতনু বলে, হ্যাঁ। বেরিয়েই যাব কিন্তু তার আগে আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই, আপনার ব্যবহার ভদ্র করুন।

"আমি পাড়ার লোক ডাকব। যাও যাও এখান থেকে।"

গেট খোলার আওয়াজ আসে। অতনু বোধহয় চলে যায়।

বৃষ্টি পড়ছে। পাশাপাশি কয়েকটা বাড়ির আলো পটাপট জ্বলে যায়। মা বোধহয় হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে যান রাহুলবাবাকে।

আমি আমার মান সম্মান ভুলে যাই। রাহুলবাবার দেওয়া অপমান গায়ে মাখার মত অবস্থা এখন নেই। আমি শবের মত শুয়ে

থাকি আমার ঘরের বিছানায়। "মা, মাগো!" গোঙানির শব্দ আসে আমার মুখ থেকে। আমার ভিজে চোখ দুটো দরজার কাছে কাকে যেন খোঁজে, পায় না।

সোহিনী

আমি সারাটা দিন খুব উদগ্রীব ছিলাম। মেয়েটা কি সত্যি সত্যি গেল ওর বাবার কাছে। রাহুলও খুব সন্দেহ করছিল। ও বলছিল, "রূপসি কোথায় গেছে ঠিক করে বল।"

আমি বলি, "জানি না।"

"জানো না মানে? আমি তোমাদের আশ্রয় দিলাম, আর তোমরা মা-মেয়ে মিলে তলে তলে কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছ।"

"আশ্রয় দিলে?" আমি তাকাই। বলি, "আমি তো তোমায় আগেই বলেছিলাম রাহুল, আমি তোমার অনুকম্পা চাই না। আমায় বিয়ে করে কোনদিন যেন তোমার মনে না হয় যে তুমি আমায় দয়া করেছ?"

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে রাহুল বলে, "তুমি ওভাবে নিচ্ছ কেন ব্যাপারটা? কল্যাণ তোমাদের প্রতি যে অবিচার করেছে, তারপরেও ওর সঙ্গে যদি কোন সম্পর্ক........।"

"কি যা-তা বলছ। কল্যাণের সঙ্গে আজ আর আমার কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। একদিন ও আমার স্বামী ছিল, আজ নেই। এখন তুমি আমায় বিয়ে করেছ, আমি তোমার বউ। আমি ওর কথা ভাববই বা কেন?"

"তুমি ভাববে না। কিন্তু তোমার মেয়ে?"

"মেয়ের কথা মেয়েই জানে। সে যদি তার বাবার কাছে যায়, আমি তো বাধা দিতে পারি না।"

রাহুল জ্বলে ওঠে, বলে, "বাবা! এই বাবাটি ছিল কোথায় কয়েক বছর আগে? লেখাপড়া শিখিয়ে কে ওকে বড় করে তুলল?"

আমি শান্তভাবে বলি, "ওর মাও চাকরি করে, একথা ভুলে যেও না রাহুল।"

রাহুলের মুখ থেকে কোন কথা সরে না। ও ঘনঘন পায়চারী করে আব সিগারেট খায়। এক সময় বলে, "তোমার মেয়ে তাহলে তার বাবার কাছেই গেছে ?"

"জানি না।"

"মন খুলে বল, কাল পর্যন্ত না ফিরলে খোঁজ কর, কিংবা থানায় ডায়েরী কব।"

আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁ করে ওঠে। ও যদি ওর বাবার কাছে না গিয়ে থাকে ? তবে ও কোথায় যাবে ? কোথায় যেতে পারে ? আজ সকালে ও কোথায় গিয়েছিল ? ওর গায়ে অত রক্তই বা লেগেছিল কেন ?

রাহুল শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। আমি জেগেই ছিলাম। হঠাৎ গেট খোলার আওয়াজ হ'ল। বেল বাজল। আমি দরজা খুলতে যাচ্ছিলাম, রাহুল আমায় বাধা দিল।

বলল, "তুমি বসো। আমি যাই।"

সাংঘাতিক কোন একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটবে, আমি সেই অপেক্ষাতেই ছিলাম। আমার বুক দুরদুর করছিল। যদি রূপ্‌সি এসে থাকে, তবে এত রাত্তিরে ও কোত্থেকে এল ?

অতনুর সঙ্গে ফিরল রূপ্‌সি। ওই রাত বারোটায় ! কি সাহস !

বাইরে খুব গোলমাল হচ্ছিল, কি বলছিল অতনু ? রূপ্‌সির সঙ্গে ওর রাস্তায় দেখা হ'ল ! বাজে কথা। এই অতনুটাকে আমার এত খারাপ লাগে। মেয়েটা নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারছে। ও আমার মত ভুগবে। ও গোল্লায় যাক্। ওর যা খুশি তাই করুক। আমার কি।

রাহুল ঘরে ঢোকে। বলে, "তোমার আদরিণী এসেছেন।"

ওর এই ব্যঙ্গ আমার বুকে হুল ফোটায়। অনেক দুঃখের পর,

কাঁটার আঘাতে ছিন্নভিন্ন আমার এই মন সুখের মুখ দেখেছে। আমার এই দুর্লভ সুখটুকু আমার মেয়ে নষ্ট করে দেবে? না না। আমি এই মেয়েকে চাই না। ও চলে যাক্। আমার জীবন দুর্বিষহ না করে ও আমায় অব্যাহতি দিক।

রাহুল একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, "তোমার মেয়ে আমার মেয়েটাকে নষ্ট করবে। টুপ্সির সামনে কোন্ উদাহরণ রাখছে ও?"

আমি কোন কথা বলি না। অপরাধীর মত মুখ নীচু করে থাকি। তারপর বলি, "ঠিক আছে, আমি ওর সঙ্গে এবার বোঝাপড়া করব।"

রাহুল বিরক্ত হয়। বলে, "আর কোন বোঝাপড়া নয়। ওকে এ বাড়ি থেকে চলে যেত বল।"

"ও কোথায় যাবে?"

"যেখানে খুশি। এই রাত একটা অবধি যাদের সঙ্গে ফুর্তি করছে, তাদেরই একটার গলায় ওকে ঝুলিয়ে দাও।"

অপমানে আমি মরে যাই। তবু আমায় সয়ে যেতে হয়।

রাহুল ঘুমিয়ে পড়ে। আমি ঘুমোই না। আমি শুনতে পাই আমার মনের মধ্যে একটা অজগরের ফোঁস-ফোঁসানি। ও কি আমার মেয়ে? না আমার শত্রু? ও কেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমায় জঘন্য অপমানিত জীবনে? ওকে নিয়ে আমার রাহুলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হবে। আমার এ ঘরও ভেঙ্গে যাবে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার ভবিষ্যৎ। এই মুহূর্তে আমাব ইচ্ছে করছে রূপ্সিকে তাড়িয়ে দিতে। ও চলে যাক। ও মরে যাক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি মা হয়ে এত বড় কথা ভাবছি।

আমি পা টিপে টিপে রূপ্সির ঘরের দিকে যাই। পাছে রাহুলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। এই নির্জন রাত্তিরেই আমি আমার মেয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হব। ওর কাছে যে আমার একরাশ জিজ্ঞাসা।

এ কি! ওর গায়ের কাপড় ভিজে কেন? ওর কি দারুণ জ্বর। ও বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে আছে।

"মা, মাগো! জল! জল!" ও জড়িয়ে জড়িয়ে বলছে।

আমি কুঁজো থেকে তাড়াতাড়ি জল গড়িয়ে দিই। হাঁ কর মা। এই তো জল দিচ্ছি।"

ও হাঁ করে। একঢোক জল খায়। আর একঢোক খেতে গিয়ে চোয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

আমি ওর কপালে হাত রাখি। আমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। গরম জল। আমি যত্ন করে ওর চোখের জল মোছাই। ওর চোখ ছুটো বোধহয় পুড়ে যায়। তাকাতে পারে না। আমি অনুভব করি ওর অভিমানাহত হৃদয় যে সহানুভূতি পায়নি তার মায়ের কাছে। বাহুল যখন সকালে ওকে অপমান করে, তখন তো আমি ওকে কোন স্নেহের আশ্রয় দিতে পারিনি।

আমি কাপড়-চোপড় বদলে দিই। ও আমার কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠে। তখন আমি কাঁদি। ও কাঁদে।

"তুই কোথায় গেছিলি রূপ্‌সি?" আমি ওকে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলি।

ও বলে, "বাবার কাছে।"

আমি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলি, "দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

আমি আর কিছু প্রশ্ন করার সাহস পাই না। আমার ভয় হয়, কি উত্তর পাব মেয়ের কাছে।

আমি থার্মোমিটার নিয়ে আসি। ওর জ্বর দেখি। একশো চার। আমি ওর মাথায় জলপটি দিই। পাখা নেড়ে হাওয়া করি।

ও বিড়বিড় করে বলে, "তুমি ওই ভদ্রলোককে কেন বিয়ে করেছিলে মা?"

"কে?" আমি যেন ইলেকট্রিক শক্‌ খাই।

রূপ্‌সি জড়ানো গলায় বলে, "আমার বাবাকে?"

"কেন?" আমি ভয়ে ভয়ে জানতে চাই।

রূপ্‌সি বলে, "দায়িত্বজ্ঞানহীন একটা....।"

আমি ওর মুখ চাপা দিই। বলি, "চুপ কর। উনি তোমার বাবা।"

ও বলে, "বাবা বলেই কি তাঁকে মাথায় তুলতে হবে? শ্রদ্ধার অনুপযুক্ত হয়েও উনি শ্রদ্ধা কুড়িয়ে নেবেন?"

"চুপ কর মা! তোমার জ্বর।"

আমি মেয়েকে থামাই। ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাবি, আজ থেকে আমাদের দেওয়াল সরে গেল। রূপ্‌সি চিনতে পেরেছে তার বাবাকে। আমায় নিশ্চয় আর মেয়ের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না—কেন আমি বিয়ে করেছি রাহুলকে।

কাক ডাকছে। ভোর হয়ে এল। আমি রূপ্‌সির বিছানাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙা চোখে কখন রাহুল এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। ও অবাক হয়ে দেখে আমায়। আমি ওকে দেখে এখন আর ভয় পাই না। শুধু বলি, "তুমি এখানে?" রাহুল বলে, "প্রশ্নটা তো আমিই করব ভাবছি।" "রূপ্‌সির খুব জ্বর।" কোন কথা না বলে রাহুল চলে যাচ্ছিল। আবার কি মনে করে জানি না ফিরে এল। আমায় জিজ্ঞেস করে, "কত জ্বর?" "এখন নেই। নোভাল-জিন খাইয়ে দিয়েছিলাম রাত্তিরে। চার পর্যন্ত উঠেছিল।" রাহুল বলে, "আবার যদি জ্বর আসে তাহলে একটা চার্ট কর।" ও রূপ্‌সির কপালে হাত রাখে। চোখ মেলে তাকায় রূপ্‌সি। রাহুলকে দেখেই ও ভুরু কোঁচাকায়। রাহুল তবু বিব্রত হয় না। ও সহজ গলায় বলে, "এখন কেমন লাগছে তোমার?" "ভাল না। তুমি সর।" রূপ্‌সি উত্তেজিতভাবে ওর হাতটা সরিয়ে দেয়। মন-মরা হয়ে ফিরে যায় রাহুল। আমার বুকের মধ্যেটা কেমন মুচড়ে ওঠে। মেয়েটা হতভাগিনী। একজনের কাছে পিতৃস্নেহ পেয়েও নিতে জানল না।

অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে রূপ্‌সি আমায় বলে, "তুমি রাহুলবাবাকে বলে দেবে উনি যেন আমার ঘরে না আসেন।" অসুস্থ। তাই আমি

ক্ষমার চোখে তাকাই। বলি, "তুমি শুয়ে পড় মা। ও তোমায় দেখতে এসেছিল।" "কেন দয়া? না দরদ?" রূপসির গলায় শ্লেষ। আমার এটা ভালো লাগে না। কোন কথা না বলে আমি ওকে শুইয়ে দিই। ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলি, "নিজেকে ছোট কর না মা।" ও কথা না বলে চোখ বোজে। আমি ভাবি, ও বোধহয় আমার কথা মেনে নেয়।

আমার তো আবার দু নৌকোয় পা। তাই আমি উঠে যাই। রাহুলের ঘরে। রূপসির রুক্ষ ব্যবহারে ও যেন আবার অসন্তুষ্ট না হয়। আমি গিয়ে দেখি, রাহুল বিছানার ওপর গম্ভীর হয়ে বসে আছে। বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে। আমি ওর পাশে বসে বলি, "কি হল তোমার?" রাহুল যেন এর অপেক্ষায়ই ছিল। বলে, "হবে আবার কি? তোমার মেয়ের কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করিনি আমি। এত অবাধ্য, অসভ্য, মেয়ে না জানে কিছু দিতে, না জানে কিছু নিতে। এতগুলো বছর ধরে আমি ত' কম চেষ্টা করিনি ওকে আপন করতে? ও কি পারল আমাদের সঙ্গে মিশে যেতে?"

রাহুলের মুখে রূপসির নিন্দেও যে অসহ্য! ও তো কথাগুলো মিথ্যে বলেনি। কিন্তু মা হয়ে মেয়ের নিন্দে আর একজনের মুখে শুনতে কি যে খারাপ লাগে। আমি বলি, "আমি তো জানি রাহুল ওর স্বভাব তুমি আর বসে কি করবে?" "এই স্বভাব বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। তুমি ওর এই স্বভাব সংশোধন কর।" রাহুল বলে। আমি বলি, "করতে পেরেছি এত বছরেও?" "কেন পারোনি?" "পারিনি সে আমার অক্ষমতা। তাছাড়া তুমি তো নিজেও বোঝ, টুপ্‌সির ওপরে তোমার আমার যে জোর আছে, এর ওপরে তা নেই। আমি ওর মা হওয়া সত্ত্বেও আমারও নেই। ওর মনের মধ্যে যে কমপ্লেক্স তা কি চট করে যাবার?" আমার কথায় রাহুল চুপ করে থাকে।

"কাল ও কোথায় গিয়েছিল?" "জানি না।" "কিছুই কি বলেনি

তোমায় ?" "তুমি এক কথা কেন বার বার আমায় জিজ্ঞেস কর বলত ?" আমার গলায় অভিমান ঝরে পড়ে। রাহুলেব তবু সন্দেহ যায় না। ও বলে "যদি ও ওর বাবার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারে, তাহলে তো ভালই।" কথাগুলো বলেই রাহুল তাকায় আমার মুখের দিকে। ও বোধহয় আমার কাছ থেকে কথা বের করতে চায়। আমি চাপা নিঃশ্বাস ফেলি। আমার মধ্যেও যে সন্দেহেব ছায়া। বুঝতে পারি না এ কথা রাহুলের আন্তরিক কি না।

ভেবেছিলাম, দ্বিতীয় বিয়ে করে সুখী হব। পুরনো ছেঁড়া জামার মতই ফেলে দেব কল্যাণের সঙ্গে আমার বিবাহিত জীবনের দিনগুলো। কিন্তু সেই অপমানিত বেদনাময় দিনগুলোআমায় এমন করে দংশন করে কেন ? রূপ্‌সিকে কল্যাণ যা বলেছে সবই শুনেছি। ছিহ্‌ ছিহ্‌, ও এত নীচ ? এত পাষণ্ড ? আমি রাহুলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলি। ওকে ঘূণাক্ষরেও বুঝতে দিই না আমি আজও পুরনো দিনকে আঁকড়ে ধরে আছি। রূপ্‌সিকে জিজ্ঞেস করি, "হ্যাঁরে, তোর বাবার শরীব কেমন দেখলি ?" আমার এই কৌতূহলে রূপ্‌সিও কি অবাক হয় ? ও তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দেয়, "ভালই তো।"

আমার আবার জানতে ইচ্ছে করে, আমি যেমন যেমন ভাবে ঘর সাজিয়ে এসেছিলাম, তেমন তেমনই কি আছে ? ওকে জিজ্ঞেস করি, "হ্যাঁরে, আসবাবপত্র কি কি দেখলি ?" ও বিরক্ত হয়। আমায় ও মুখ ঝাম্‌টা দেয়। বলে, "জানি না !" তারপরই ও আমায় বলে, "বাবার যে মাসি ওখানে এসে মাঝে মাঝে থাকেন উনি কি তোমার সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করতেন ?" "একথা কেন জিজ্ঞেস করছিস ?" "আমার খুব ফিকে মনে পড়ে ওঁকে।" রূপ্‌সি বলে, "উনি তোমায় অপছন্দ করতেন।" আমি আশ্চর্য হয়ে তাকাই। "ওকে কি দেখলি নাকি ?" "না।" "তোর এত কথা মনে আছে ?" "মনে ছিল না। ভুলে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে মনে পড়ল।" একটু থেমে রূপ্‌সি বলে, "আচ্ছা, মা, উনি কি বাবার আপন পিসি ?" "হ্যাঁ।"

"ওঁর কে কে আছেন? মানে বিয়ে করেন নি?" "করেছিলেন ডিভোর্স হয়ে গেছে।" "উনি কোথায় থাকেন?" "কল্যানীতে মাস্টারি করেন।" "বাবার আত্মীয়-স্বজন আব কে আছেন?" "অনেকেই আছেন। কিন্তু তোমার বাবা কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না।"

"শুধু ওই পিসির সঙ্গে?" "হ্যাঁ।" "ওর সঙ্গে কি ওঁর কোন অবৈধ সম্পর্ক ছিল?"

আমি ভারি আশ্চর্য হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকাই। আমার মেয়ে এত বড় হয়ে গেছে? ও এত কথা বুঝতে শিখেছে? "একথাও কি তুমি বুঝেছিলে ছোটবেলায়? এত কথা বোঝার বয়েস তোমার তো তখন নয়।" মেয়ে বলে, "হয়ত তখন বুঝিনি সব। এখন আমার মনে হল। অস্পষ্ট স্মৃতি থেকে কিছু, তোমার কথা থেকে কিছু"—রূপ্‌সি কি যেন ভাবে। খানিক বাদে ফের বলে, "তুমি বাধা দাওনি?" "দিয়েছিলাম। কোন লাভ হয়নি।" "আমি আবার যাব। ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে এবার মোলাকাত হয়নি। ওঁর সঙ্গে আমাব দেখা কবা দরকার। আমি ওঁকে শুধোব, আমার মায়ের জীবনটা উনি কেন এভাবে নষ্ট করে দিলেন?" "না না।" আমি বাধা দিই। বলি, "পাঁক ঘেঁটে কোন লাভ হয় না রূপ্‌সি। নিজের গায়েই পাঁকের জল লাগে। তুমি ভাগ্যকে মেনে নাও। শান্তি পাবে।" ও তেজী বেতের মত সোজা হয়ে বলে, "রাহুলবাবাকে বিয়ে করে তুমি আমার এই যে সর্বনাশটা করলে এও ভাগ্য বলে মেনে নেব?" আমার মনে হয়, আমার মেয়ে যেন আমার মুখে চাবুক মারে। কিছুক্ষণ আমি কোন কথা বলতে পারি না। তারপর বলি, "আমার এত বড় জীবনটা একা একা কি করে কাটাতাম বলত? আমার কি একজন সঙ্গীর দরকার ছিল না?" "তুমি ওদের অন্যায়কে কেন বাড়তে দিলে?" "ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার মত শক্তি আমার ফুরিয়ে গিয়েছিল। আজ বলতে লজ্জা নেই। তোমার বাবার ওপর থেকেও আমার মন সরে এসেছিল।"

আমার মেয়ের জেরা শেষ হয়। আর যেন ওর কিছু জানবার নেই। ও আমায় কতটুকু বোঝে জানি না। আমি ভাবি, ও আবার না গিয়ে হাজির হয় ওর বাবার কাছে। "রূপ্সি শোনো," আমি ডাকি। ও ফিরে তাকায়। ওর চোখের আগুন এখনো নেভেনি। আমি বলি, "তুমি আর ও বাড়ি যেও না। ওখানে গেলে তোমার মনের বিক্ষোভই বাড়বে। লাভ হবে না কিছুই। ওঁদের কদর্য জীবন তোমায় যন্ত্রণা দেবে। তুমি ওঁদের ভুলে যাও।"

"ভুলে যাওয়া কি অতই সহজ? আমি অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে চলি না।" একটু থেমে রূপ্সি বলে, আমার বাবাকে জব্দ করতে গিয়ে তুমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, আমি তারও প্রশংসা করি না।" আমি স্তম্ভিত-ভাবে তাকাই মেয়ের দিকে। রূপ্সির সঙ্গে বেশী করে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করি। বুকে বড় ব্যথা।........

আমি অফিসে যাই। কাজ করি। মন লাগে না কিছুতেই। এক মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে আর এক মেয়ের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করি। টুপ্সির দিকে তাকানোর সময় পাইনি অনেক দিন। ও অভিমান করে, "তুমি তো দিদির সঙ্গেই কথা বল, সব সময়। দিদিকেই বেশী চাও।" "ওরে নারে না। আমার কাছে তোরা দুজনেই সমান।" "আচ্ছা মা, দিদির বাবা আর আমার বাবা আলাদা কেন?" "বড় হলে বুঝতে পারবে।" "আমি জানি।" ও ঠোঁটে আঙ্গুল কামড়ে হাসে। আমি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পাই না। ওর জানাটুকু কোথায় গিয়ে পৌঁছেচে কে জানে? আমি ওকে চেপে দিয়ে বলি, "দেখি স্কুলের রিপোর্ট। পড়াশুনো কেমন করছ টরছ?" ও ঠোঁট উল্টে বলে, "তুমি কি আমায় আর পড়াও?" "তাই তো! আচ্ছা মা মণি, তোমার বইপত্র নিয়ে এসো তো? হোমটাস্ক্ কি আছে দেখি?" ও লিখতে লিখতে হঠাৎ মুখ তুলে বলে, "তুমি দুটো বিয়ে করেছিলে তাই না?" "টুপ্সি!" আমি অস্ফুটে বলি।

আমার কানের মধ্যে তুই মেয়ে যেন চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "তুমি এ কোন্ আদর্শ দেখালে মা ?" ওরা যেন আমায় ধিক্কার দেয়। আমি চোখ টান করে তাকিয়ে থাকি টুপ্‌সির দিকে। ও ভয় পায়। ও করুণ গলায় ডাকে, "মা !"

আমি আজকাল পুরোপুরি যান্ত্রিক মানুষ হয়ে গেছি। কারো সঙ্গেই বিশেষ কথাটথা বলি না। আমি যেন সংসারের সব পাওনাটুকু এখনই পেয়ে গেছি। রূপ্‌সির কাছে আমি কোন আশা করি না। টুপ্‌সির কাছেও আমার কোন প্রত্যাশা নেই। রাহুলের কাছেও আমার যেন কিছু চাইবার নেই। রাহুল আমায় বোঝায়, "তুমি এত ভেঙ্গে পড়ছ কেন ? তোমার মেয়েরা তোমায় একদিন চিনবে। তাছাড়া আমি ? আমি কি নেই তোমার পাশে ?"

"ওরা আমায় কোনদিন বুঝবে না। ওরা আমায় ছোটই মনে করবে রাহুল। ভাববে মা চরিত্রহীনা।" "ছিঃ ছিঃ ! একি বলছ তুমি ? রাহুল বলে এক স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যদি তুমি দ্বিতীয়বার বিয়ে কর, সেটা কি অপরাধের ? তোমার মেয়েদের সঙ্গে তোমার খোলাখুলি আলোচনা করা দরকার।" এ যেন সেই পুরনো রাহুল। যে আমায় অভয় দিয়ে নিয়ে এসেছিল তার ঘরে। আমায় বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল। ওর কথায় আমি জোর পাই। ভাবি, আমার এই মধ্যবিত্তসুলভ মনটাকে এবারে আমি তাড়াব। সত্যিই আমি আমার মেয়েদের কাছে অকপটে নিজের কথা মেলে ধরব। তারপর আমি জানতে চাইব, তাদের বিচারে আমি অপরাধী কি না ?

আমার একজন সঙ্গীর দরকার ছিল। তাই আমি দ্বিতীয় বিয়ে করেছি। তোমাদের ওপর কোন অবহেলা তো আমি করিনি।

সেদিন রাহুল অফিস থেকেফিরে বলে, "চল দার্জিলিং ঘুরে আসি। আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে। বহুদিনের পুরনো বাড়ি। বারো মাস

তালা চাবি বন্ধ থাকে। ওরা যখন যায়টায় তখন বাড়িটা ব্যবহার হয়। এই সিজনে ওরা যখন যাচ্ছে না তখন আমরাই না হয়....।

আমি বিরক্তবোধ করি। ভালো কথাও আমার এখন সহ্য হয় না বলি, "তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাও। আমি এখন কলকাতা ছেড়ে নড়ছি না। "কেন, কলকাতায় কি মধু আছে তোমার ?" ওর খোঁচাটা খট করে আমার কানে বাজে। জবাব দিতে ইচ্ছে হয় না।

রূপসির মধ্যে আরও অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। ও আজকাল প্রায় সারাদিনই বাড়ি থাকে না। আমি অবশ্য দশটায় অফিসে চলে যাই। মাঝে মাঝে ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে বাড়িও বসে থাকি যেদিন বাড়ি থাকি সেদিন দেখি রূপসির এই আপত্তিকর পরিবর্তন কাজের লোকের কাছে খবর পাই রোজই নাকি সে এই করে। ৎ যখন বাড়ি ফেরে কোন কোনদিন ওর সঙ্গে রূপেনকে দেখি। কোনদিন দেখি অতনুকে। বুঝতে পারি না ওর মনের গতি কোন্ দিকে। কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়ে পাছে অপমানিত হই, সেই ভয়ে চুপ করে থাকি।

॥ রূপসি ॥

চুম্বকের মত ঢাকুরিয়া আমায় টানে। আমি জানি না, কেন বার বার ছুটে যাই বাবুবাগান লেনের ওই চেনা বাড়িটায়। কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারি না, কোন এক অদৃশ্য শক্তির হাতছানি। বাসস্টপে নেমে খুব সাবধানে হাঁটি। লাইটপোস্টের ভূতুড়ে আলো-গুলোর নীচে, নিজেকে খুব নির্লজ্জ লাগে। সেদিন সেই বৃষ্টির রাতে যে ভাবে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলাম, এরপরও সেখানে আমায় যেতে হয়। অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় চোখে জল আসে। বাবার ঘরের জানলার পাশে আমি চুপি চুপি গিয়ে দাঁড়াই। কাঠ-গোলাপের গাছটার নীচে সামান্য অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি। বাতাসে জানলার পর্দা যখন ওড়ে, তখন আমার চোখে পড়ে বাবার চিন্তিত মুখটা। অফিস থেকে ফিরেছেন বোধহয় এই কিছুক্ষণ আগে।

ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে কাগজ নিয়ে বসেছেন। সত্যিই কি কাগজ পড়ছেন উনি? বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবেন। তখন একটা কবুতরের ডানার ঝাপট শুনি আমার বুকের মধ্যে। যে বুক আমার বাবার দান, সেই বুকের মধ্যে কোন এক অদৃশ্য শিল্পী একজন সংগ্রামী মানুষের ছবি এঁকে চলে।

এভাবে কতদিন চলবে? বাবার সঙ্গে আমি হয়ত আর কোন-দিনই মুখোমুখি হব না। অথচ ওঁর প্রতি আমার এই দুর্বলতাকে ত্যাগ করার হাতিয়ারও তো জানা নেই। এই অভিশপ্ত জীবনের বোঝা কতদিন টেনে নিয়ে বেড়াব?

মিলিমাসিকে দেখতে খুব ইচ্ছে হয় আমার। যে মহিলা আমার। বাবাকে কেড়ে নিয়ে আমায় ভিখারী বানিয়েছেন, সেই স্নেহের ভিখিরী আমি জীবনে অন্ততঃ একবার তাঁর মুখোমুখি নিশ্চয় হব। আমি কি খুনী, ডাকাতের ভূমিকা নেব? কিংবা হিংস্র বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ব ওঁর ওপরে? বুঝতে পারি না। হয়ত কিছুই বলতে পারব না, তাও হবে। ওঁরই বা কি দোষ, আমার বাবা যদি ইচ্ছে করে চরিত্র খারাপ করেন?

এই লোকটি যিনি আমার বাবা, তাঁর জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়। সংসার ভেঙে তছনছ করে এই নির্বাসিত জীবন কেন যে বেছে নিলেন, জানতে সাধ হয়। নির্বাসিতই বলছি। আমি তো বেশ কয়েকবার এখানে এলাম। মিলিমাসিকে তো কোনদিন চোখে পড়ল না। ওঁদের বোধহয় বেশ কিছুদিনের দূরত্বে আজকাল দেখা হয়। একটা বিশেষ বয়সের পর শরীরের নেশা নাকি মানুষের আর থাকে না। কিন্তু আমার বাবা তো এখনো বুড়ো হয়ে যান নি। বাবার বয়স মাত্র পঞ্চাশ তবে কি বাবার মধ্যে ক্লান্তি এসেছে? মিলিমাসির সাহচর্য আর ভাল লাগছে না?

আমার মায়ের মত মহিলাকে ওঁর পছন্দ হ'ল না। এ দুর্ভাগ্য কার জানি না, আমার মায়ের? না বাবার?

অশরীরী আত্মার মত ঘুর ঘুর করি এই জানলার পাশে। আজকাল মনে হয়, আমার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। এই সন্ধ্যার আকাশে একটা বিষণ্ণ পাখী হেঁকে হেঁকে চলে যায়। বাবার গলা শুনি, "ময়না, লেটারবক্সটা দেখেছিস্ কোন চিঠি এসেছে কিনা? ময়না বলে, "দেখেছি। কোন চিঠি নেই।"

দুদিন আমি এই কথাই শুনি। বাবার প্রশ্ন। ময়নার উত্তর। ভাবি, কে এত চিঠি লিখবে বাবাকে? বাবার মাসি? বুঝতে পারি না। বুঝতে পারি না ওদের সম্পর্কের মধ্যে কোন চিড় খেয়েছে কি না। একটা সার্কাসের জোকার যেন হাততালি দেয় বাবা আর তাঁর মাসির দিকে তাকিয়ে। জোকারটা যেন আমার দিকেও তাকায়। হাসে। বলে, "চমৎকার মেয়ে। চমৎকার। যে বাবা তাঁর মেয়েকে তাড়ায়, সেই বাবার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে বেহায়া মেয়ে বাবাকে দেখে। ছিহ্, ছিহ্।"

জোকারটার চড় খেয়ে আমি পালিয়ে আসি। সে দাগ মুছতে আমার অনেক সময় লাগে।

পরীক্ষা হয়ে গেছে বলে অফুরন্ত সময়। ঘুরে ঘুরে বেড়াই। একা একাই ঘুরি। কখন অতনু সঙ্গে থাকে। অতনুর সঙ্গে গড়ের মাঠে বসে চাঁদ দেখি। ফুচ্‌কা খাই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের স্ট্যাচুর নীচে বসে নায়কের সেই গতানুগতিক সংলাপ শুনি। অতনু আমার হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে। অনেক সময় আমার চুলের মধ্যে নিজের মুখ গুঁজে দেয়। অতনু গাঢ় গলায় বলে, "আমি তোমার চুলের অরণ্যে হারিয়ে যেতে চাই।" এই পৃথিবীর সবই খুব পুরনো লাগে আমার। এই ভালবাসাটাসা। দলে দলে নায়ক, নায়িকারা আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়। মেষ শাবকের পালের মত ওদের খুব অসহায় লাগে। মনে হয়, ওরা সময়ের হাতে বন্দী। একটা বিশেষ মন, একটা বিশেষ বয়সের সময়। সেই সময়—

রাখাল ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আমি অতনুকেও সেই দলে ফেলি। কিন্তু আমি? আমি কি বুঝতে পারি না।

দুপুরবেলা একা একাই সিনেমা হ'লে ঢুকে পড়ি মাঝে মাঝে। লোডশেডিংয়ের মধ্যে সিনেমা দেখি। পাখা নেই। শুধু জেনারেটরে বই চলে। অন্ধকার হল। হাজার মানুষের গরম নিঃশ্বাসে বাতাস দূষিত। সর্দিগর্মিতে মানুষ হাঁচি দেয় বার বার। মানুষের গায়ের ঘামের পচা গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিই। তবু সিনেমা দেখি। আসলে আমি তো সিনেমা দেখি না। আমি দেখি মানুষের ধৈর্য, সহ্যের সীমা। কোন বিদ্রোহ নেই। এই চাপা, ভ্যাপ্‌সা গরমের মধ্যেও, এই দম বন্ধ করা প্রেক্ষাগৃহে তারা হাসিমুখে সিনেমা দেখে চলেছে। মানুষ যেন জন্তু, জানোয়ার হয়ে গেছে। আমিও সেই মানুষের খাতায় নিজের নাম লেখাই। অন্ততঃ কিছু সময় ভুলে থাকি নিজের ব্যক্তিগত পরিচয়। আমি রূপ্‌সি। আমার বাবার নাম। মায়ের নাম। আমাদের তিনজনের আলাদা জীবন।

সিনেমা হ'ল থেকে বেরিয়ে এসে আমি নিজের দিকেই তাকাই; ধৈর্য খুঁজি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, কিছুতেই অধৈর্য হব না। আমি দেখব বাঁচার রাস্তাটা কোথায়?

॥ মোহিনী ॥

দার্জিলিং যাওয়াই ঠিক হল। আমায় না জিজ্ঞেস করেই রাহুল টিকিট কেটেছে। আমি তো অবাক। বলি, "ছুটি? আমার বোধহয় আর ছুটি পাওনা নেই।" ও বলে, "খুব আছে। আমি হিসেব করে দেখেছি তোমার মেডিকেল-ফেডিকেল, ক্যাজুয়াল ইত্যাদি নিয়ে এখনো দিন পনেরর ছুটি হাতে আছে। আমি তো দিন দশেকের প্রোগ্রাম করেছি। তার মধ্যে যাতায়াতের জন্য তিনদিন।" আমি হাসি। অনেকদিন পর আমরা আবার সহজ হই। আমরা একে

অন্যকে জড়িয়ে নিবিড় সান্নিধ্য খুঁজি। রাহুল আমায় বলে, "তোমার হাসি মুখ আমি দেখতে চাই সোহিনী। তুমি হাসো, হাসো লক্ষ্মীটি।" আমি হাসি। ভাবি, "ও আমার জীবনের প্রথম প্রেমিক হল না কেন? কেন এই বিয়ে আমার প্রথম বিয়ে হল না?"

শুধু রূপসির দিকে তাকালেই আমার বুকের মধ্যে টাটায়। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ও যেন শান্তি পায়। যদিও 'শান্তি' শব্দটা খুব কঠিন। আমিই কি শান্তি পেয়েছি? আমার এই জটিল জীবনের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে আমিই কি মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠছি না? আমার এই দ্বিতীয় বিয়েও কি পুরোপুরি সুখের হয়েছে? হয়নি। রাহুল আর রূপসির দ্বন্দ্ব আমার মনটাকে বার বার ছিটকে ফেলে দিয়েছে আমার প্রথম স্বামীর সংসারে।

রাহুলেব মন রাখতে গিয়ে আমায় রূপসিকে হারাতে হয়। রূপসিব মন রাখতে গিয়ে আমায় রাহুলের ব্যঙ্গ বাক্যবাণ শুনতে হয়।

আমাব প্রায়ই ভয় হয়, রূপসির জন্য আমার এই দ্বিতীয় ঘরও না ভেঙ্গে যায়।

গোছগাছ করছি। আমাদের যাবার আয়োজন। রাহুল আমার বেডিং বাঁধায় সাহায্য করছে। টুপসি ঘুমিয়ে পড়েছে। রূপসি বাড়ি নেই। আজকাল তো ও বলে যায় না, কোথায় যায়টায়। রাত ন'টা বাজে। আসা উচিত ছিল এর মধ্যে।

"মাসিমা! মাসিমা!" কে ডাকছে? পাশের বাড়ির জানলায় মনে হচ্ছে? রাহুলই এগিয়ে যায়।

"কি হল সোনা?" পাশের বাড়ির মেয়েটি সোনা বলে, "মাসিমার ফোন।"

কথাটা আমার কানে যায়। রাহুলকে বলি, "ওকে জিজ্ঞেস কর কে ফোন করছে?"

রাহুলের কথায় সোনা আবার যায় টেলিফোনের কাছে। "হ্যালো !........!"

এ বাড়িতে বসেও আমি শুনতে পাই। সোনা চেঁচিয়ে বলে, "রূপেন, রূপেন টেলিফোনে ডাকছে মেসোমশাই।"

রাহুলের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। ও আড়চোখে তাকায় আমার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমার বুকের রক্ত চল্‌কে ওঠে। আমি জানি রাহুল পছন্দ করে না রূপসির কোন বন্ধুকে। কিন্তু আমি নিরুপায়। ফোন আমায় ধরতেই হবে।

"হ্যালো।" "কে মাসিমা?" "তুমি রূপেন?" "হ্যাঁ, রূপসি আজ বাড়ি ফিরছে না। ও আমায় ফোন করে জানিয়ে দিতে বলল।" "সেকি বাড়ি ফিরছে না মানে? কাল তো আমরা দার্জিলিং যাচ্ছি। ওরও তো টিকিট কাটা।" "ও নাকি যাবে না দার্জিলিং।" রাগে আমি ঠোঁট কামড়াই। কোন প্রশ্ন না করে ফোন নামিয়ে রাখি। মেয়ের এতদূর সাহস! রাতে তিনি বাড়ি পর্যন্ত ফিরবেন না? তবে যাবেন কোন চুলোয়? দার্জিলিং যাবে না? ইয়ার্কি! আগে বলতে পারে নি। এতগুলো টাকা খরচ করে টিকিট কাটা হল! এখন আমি রাহুলের কাছে মুখ দেখাই কি করে।

অস্থির উত্তেজনায় কেটে গেল আমার সারা রাত। মেয়ে কোথায় গেল? রাহুল আর আমায় এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করছে না। সারা রাত আমরা পাশাপাশি শুয়ে আছি। অথচ কোন কথা নেই। আমার মেয়ে কোথায় গেল না গেল তা নিয়ে যেন ওর কোন মাথা ব্যথাই নেই। রাহুলের সঙ্গে আমার বিবাহিত জীবনের এতগুলো বছরের মধ্যে এই প্রথম যেন ওকে অনেক দূরের মনে হয়। আমার খুব অসহ্য লাগে আজ এক বিছানায় ওর সঙ্গে এই রাত্রিবাস। আমি বুঝতে পারি এই দূরত্ব ক্রমশ বাড়বে। ভয় হয়, এটাও কি তাসের ঘর? বুঝতে পারি না।

আমার মেয়ে রাহুলেরও মেয়ে, এই শর্ত মেনেই তো ও আমায়

বিয়ে করেছিল। রূপ্সি আজ যতই বেপরোয়া হোক তাকে সামলানোর কিছুটা দায়িত্ব ওরও কি ছিল না? রূপ্সির ওপরে রাগ করে রাহুল নিজেকে ওর কাছ থেকে গুটিয়ে নিয়েছে। শুধু রাগ হয়, সেইসঙ্গে খানিকটা ঘৃণাও নয় কি? রাহুলের বরাবরই অহংকার ছিল ও রূপ্সির জন্য অনেক করেছে। ও দারুণ উদারতার পরিচয় দিয়েছে রূপ্সিকে এখানে জায়গা দিয়ে।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে আয়নায় দেখি, গত রাতের ক্লান্তির ছাপ আমার চেহারায়। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যতদূর দেখা যায় সামনের রাস্তাটা দেখি, এখনো যদি ও আসে। দার্জিলিং যাবার আর এতটুকু উৎসাহ নেই। রাহুল যদি ওর নিজের বাবা হত তাহলে এখুনি যাওয়া স্থগিত রাখত। ওর নিজের বাবাও কি........? দূর, দূর! কপাল বড় খারাপ রূপ্সিটার। কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে তাই বা কে জানে! বড় বোকা মেয়েটা। ওর দুর্ভাগ্য। ও ওর মাকে চিনল না। ও কি আর কোনদিন ফিরবে? এখন রূপেন-কেই আমার চাবকাতে ইচ্ছে করছে। আমি কি বোকামী করেছি! ওদের একজনের ঠিকানা লিখে রাখিনি!

রাহুল ওর মেয়েকে নিয়েই ব্যস্ত। সকাল থেকে হাঁক ডাক লাগিয়ে দিয়েছে রাহুল। "টুপ্সি! দাঁত মেজে ব্রাস কোথায় রাখলে? দাও স্যুটকেসে ঢুকিয়ে রাখি। টুপ্সি! তোমার বাড়িতে পরা চপ্পল?....দাও দাও, কাগজে প্যাক করেছ? দেখি, তোমার আর কি ঢোকানোর আছে স্যুটকেসে?"

শুধু টুপ্সিরই নয়। ও আমার জিনিসপত্র গোছানো নিয়েও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কাজের লোক বাড়িতে পাহারা দেবে। কথা ছিল আর কেউ থাকবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রূপ্সির ব্যবস্থাও আমায় করে যেতে হল।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়। রাহুল মালপত্র তুলে টুপ্‌সিকে নিয়ে বসে পড়ে, ভেতরে। আমি ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়েও আর একবার চোখ বুলিয়ে নিই। যদি সে আসে। কাল যখন বাড়ি থেকে ও বেরিয়ে যায়, তখন যদি একবারও বুঝতে পারতাম, ও আর আসবে না! ছিঃ ছিঃ একথা বলছি কেন, ও আর আসবে না।....কাল রূপেনকে কেন যে জিজ্ঞেস করিনি, আজ ও বাড়ি ফিরবে কি-না? উচিত হয় নি ফোনটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখা!....এখন অনুশোচনা আসে নিজের এই হঠকারিতায়।

দার্জিলিং-এর ঠিকানাটা রেখে যাই কাজের লোকের কাছে। যদি রূপ্‌সির মনে হয়, মাকে তার খবরাখবর দেবার।

অগুণতি মানুষের ভিড়। হকারের চেঁচামেচি, লাউড স্পীকারে ঘন ঘন ঘোষকের ঘোষণা, "দার্জিলিং মেল সাতটা দশ মিনিটে আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে....।" রাহুল চেঁচামেচি করছে ফ্লাস্কটা কোথায়? কার কাঁধে? তারপর সেই বেতের ঝাঁপিটা?" টুপ্‌সি বলছে, "এই তো এই যে....এ....।"

টুপ্‌সি বলছে, "ও বাবা! গাড়ী ছাড়লেই আমি কিন্তু বাংকে উঠে পড়ব।"

আশ্চর্য! ওরা কেউ একবার ভাবছে না রূপ্‌সির কথা? আলোয় আলোময় প্ল্যাটফর্ম। আমার চোখদুটো ছুটে বেড়ায় প্ল্যাটফর্মের আনাচে কানাচে। ও তো জানে, দার্জিলিং মেলের সময়। যদি আসে?

"মা! দিদি, দিদি।" "কোথায়?" "ওই তো ওই যে....এ।" টুপ্‌সি চেঁচিয়ে বলে। "ও মা, তাই তো!" নীল শাড়ীটা পরে কাঁধে ব্যাগ দুলিয়ে দুলিয়ে আসছে সে। আর একটু জোরে জোরে পা ফেলতে পারছে না? আশ্চর্য মেয়ে বটে! আমার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে। ও ধরতে পারবে তো আমায়? শেষ হুইসেল মেরে ট্রেনটা তখন

তুলতে শুরু করেছে। রূপ্সিও পায়ের গতি বাড়িয়ে এখন ছুটছে। ইস! এই ছোটাটা যদি কিছুক্ষণ আগে হত! ও কি ধরতে পারবে আমায়? আমি ব্যস্তভাবে রাহুলকে বলি, "রাহুল! অ্যালার্ম চেনটা টানলে হয় না?" রাহুল কথাটা যেন শুনতেই পায় না এমন ভাব করে বাংকে বেডিংটা বিছোতে থাকে। আমি জানলায় মুখ বাড়িয়েই আছি। আমার চোখদুটো ঝাপ্সা হয়ে আসছে। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। রূপ্সি ছুটছে। ও যেন কি বলতে চায়। ওর বলা হয় না। ও হাত নাড়ে। আমি আমার হাতখানা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিই। বড় লোভ হয় মেয়েটাকে একটু ছোঁবার।

এই প্রথম এই বিশাল কলকাতার জনারণ্যে আমি আমার মেয়েকে একা ফেলে রেখে গেলাম। যতদূর দৃষ্টি যায় আমি শুধু দেখি। ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মত আমার মেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

॥ রূপ্সি ॥

আমার চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনটা বেরিয়ে যায়। এত আশ্চর্য আমি বোধহয় আর কখনও হইনি। ইচ্ছে করলেই যে ট্রেনটাকে ছুঁতে পারতাম। যাক্, এ ভালই হ'ল। কথা হলেই মা হয়ত এলোমেলো বকতেন। কৈফিয়ত চাইতেন কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলাম? আমার আর এখন মোটেই ভাল লাগে না মার কাছে এভাবে জবাবদিহি করতে। আমি কি বড় হইনি? আঁচলে গেরো দিয়ে আর কতকাল রাখবেন উনি?

প্ল্যাটফর্ম অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। চাঅলাকে ডেকে আমি এক খুরি চা খাই। এখন নিজেকে খুব স্বাধীন মনে হয়। আজ আর আমার কোন অভিভাবক নেই এই কলকাতা শহরে।

মাথার ওপরে এক টুকরো সাদা মেঘ ভেসে যায়। আমি গুন্ গুন করে সুর ভাঁজি। মায়ের জন্যে এখন একটু মন খারাপ হয়। ঘামে ভিজে শরীরটা জ্যাব জ্যাব করছে। বাড়ি গিয়েই স্নান করে ফেলব।

বাড়ি? কার বাড়ি? মায়ের বাড়ি। কথাগুলো ভেবেই আমি ঠোঁট ভেঙে হাসি আমার এই পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি দেহটার দিকে তাকিয়ে। আমি অবশ্য পাততাড়ি গুটিয়ে নিচ্ছি শিগগিরই। নাগা পাহাড়ের কোহিমায় একটা কাজ পেয়েছি। দিন আষ্টেক বাদেই আমার জয়েনিং ডেট। চাকরীটা ল্যাবরেটারী এ্যাসিসট্যান্ট। মাইনে শ' চারেক টাকা। আমার ওতেই চলে যাবে। থাকার জন্যে ঘর দিচ্ছে ওরা। উঁহু, ভাড়া ফাড়া নয়। স্রেফ ফ্রি লজিং। বলব বলব করে মাকে আর বলা হয়নি কথাটা, যদি আবার বাগড়া দেন? "অতদূরে যাবি?" এই মহিলাটি বড় অদ্ভুত। শুধু চোখের জল ফেলেন, আর আমায় পিছু টেনে রাখেন।

খবরের কাগজ দেখে দরখাস্ত করেছিলাম মাসখানেক আগে। এ ভাবে লেগে যাবে ভাবিনি। অতনুব বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলাম। ভরসা করে মায়ের বাড়ির ঠিকানা আর দিইনি। দিন তিনেক আগেই অতনু আমায় দিয়ে গেছে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার। একটা ইন্টারভিউ পর্যন্ত নিল না। শুধু পার্ট ওয়ানের নম্বর দেখেই খুশি। এর নাম ভাগ্য। সেদিন অবশ্য মাথা ঠুকে প্রণাম করে এসেছি কালীঘাটের মন্দিরে। সিঁদুর মাখা পা দুটো ছুঁয়ে বলে এসেছি "মা। তুমি একেবারে নির্দয় নও।"

এই চারশো টাকার চাকরী আমার অনেক দিল। একটা পাঁকের পৃথিবী থেকে আমায় টেনে এনে একটা মুক্ত জগতে পৌঁছে দিল। অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারখানা বুকে চেপে ধরে সেদিন আমি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম। সে কান্না দুঃখে নয়, আনন্দে।

আমি কবে হাঁটতে শিখেছিলাম জানি না। কবে আমার দুঃখিনী মা দু' হাত ধরে আমার নড়বড়ে পায়ে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে আমায় বলেছিলেন, "হাঁটি হাঁটি পা………।" সেই কথাগুলো যেন আমার কানে স্পষ্ট বেজেছিল। আমার মনে হয়েছিল, সেদিন নয়। আমি আজই প্রথম হাঁটতে শিখলাম। জীবনের উনিশটি বসন্ত কেটে যাবার পর।

কে আমায় হাঁটতে শেখাল আমি জানি না। আমার মা নয়। বাবা নয়। আমার দুর্ভাগ্যময় জীবনের কিছু তিক্তকর অভিজ্ঞতা।

আজ এই আলোকিত প্ল্যাটফর্মে বহু মানুষের মিছিলে চলতে চলতে আমি মনে মনে বলি। "গুডবাই তোমায় আমার জন্মদাত্রী মা! এতদিন তোমার অনেক সমস্যা বাড়িয়েছি। সেই জন্মমূহূর্ত থেকে অনেকগুলো বছর আমি তোমার কাছে ঋণী। তোমার সেই ঋণ শোধ করব এমন ক্ষমতা আমার নেই। তবু দূরে সরে গিয়ে তোমার সমস্যা খানিকটা লাঘব করতে চাই। তুমি তোমার স্বামী মেয়েকে নিয়ে সুখে থাক।" আমার মা সোহিনী যেন হাসেন। বড় প্রশান্ত সে হাসি। আমি ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে কপালে সেলুট ঠুকে হাসি।

উনি যেন আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাতটা তোলেন, "দুষ্টু মেয়ে! তুই আজ সত্যিই নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিস।"

এখনো আছে আমার ব্যাগে সেই অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারখানা। দেখানো হ'ল না মাকে। বলা হ'ল না সেই আশ্চর্য খবর। "আমি হাঁটতে শিখেছি মা!" ইঞ্জিনের ঝক্ ঝক্ আওয়াজ মিশে যেতে থাকে আমার বুকের ধুক্‌ধুকানিতে। আমি পেছন ফিরে আর একবার তাকাই। আমার মায়ের শেষ ব্যাকুল চাউনিটা যেন হাওয়ার মধ্যে ভেসে বেড়ায়।

হঠাৎই মনে পড়ে যায়, অতনুকে কথা দিয়েছিলাম—গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়াব আটটায়। কিন্তু এই আধঘণ্টায় আমি কি পৌঁছুতে পারব সেখানে? আমি চট্‌পট হাঁটি শেয়ালদা সাউথ স্টেশনের দিকে।

কাউণ্টারের সামনে লম্বা কিউ। লাইনে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধাকে বলি, "আপনি কোথায় যাবেন?"

"যাদবপুরে।"

"তবে আর হ'ল না।" আমি বিড় বিড় করি।

লাইনে দাঁড়ানো একজন মধ্যবয়সী মহিলা বলেন, "কেন কি দরকার?"

হাসিমুখে বলি, "বালীগঞ্জের কোন যাত্রী পেলে সুবিধে হত। একটা টিকিট কাটিয়ে নিতাম।"

উনি তাড়াতাড়ি বলেন, "আমিই তো বালীগঞ্জে যাব।"

"তাই নাকি?" আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাই। "আমার একটা উপকার করবেন?"

"ঐ টিকিট কাটার ব্যাপারে তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ একটা বাড়তি টিকিট আপনার টিকিটের সঙ্গে যদি........।"

"হয়েছে, হয়েছে, আর অত বিনয়ে কাজ নেই। দাও পয়সা দাও।"

আমি হেসে ওঁকে পঁচিশটি পয়সা গুণে দিই। ভাল লাগে মহিলার এই সহজ আন্তরিকতা। লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় উনি বলেন, "তোমার মুখটা খুব চেনা চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে।"

"কোথায় আর দেখবেন? বালীগঞ্জে থাকেন যখন, গড়িয়াহাট-টরিয়াহাটে দেখে থাকবেন হয়ত।"

"না, না, আমি বালীগঞ্জে থাকি না। আমি এখন যাচ্ছি অন্য কাজে বালীগঞ্জেই।"

আমি কথা বাড়াই না। জিজ্ঞেস করি না কোথায় থাকেন? ভদ্র-মহিলা কৌতূহলী চোখে আমায় তবু দেখতে থাকেন। আমি অস্বস্তিতে মুখ ফেরাই।

উনি বলেন, "তোমায় তুমি বললাম বলে কিছু মনে কর নি তো?"

"না, না, মনে করব কেন?"

ভদ্রমহিলার সামনে তখন জনা সাতেক মহিলা দাঁড়িয়ে। এই লাইনে উনি অষ্টম মানুষ। আমি ঘড়ি দেখি, আর মাত্র মিনিট সাতেক বাকী। ধরতে পারব তো লক্ষ্মীকান্তপুর লোক্যাল?

অতনু আজকাল বেশ অভিমানী হয়ে উঠেছে। আমায় খুব কথা-টথা শোনায়। আমার ওপরে ওর যেন অনেক দাবী। সেদিন

সেই বৃষ্টির রাতে আমায় রিক্স করে বাড়ি পৌঁছে দেবার থেকে এটা হয়েছে। আমি উপভোগ করি ওর অভিমান। বুঝতে পারি ওকে এই সুযোগটা আমিই দিয়েছি। কেন সেদিন রিক্সায় ওর কাঁধে মাথা রাখতে গেলাম? কেন বললাম, "অতনু তুমি আমায় ছেড়ে যেও না।" জ্বর আমার শরীরের সঙ্গে মানসিক দুর্বলতাও এনেছিল। আর আশ্চর্য তখন সেই দুর্বল মুহূর্তে অতনুকে আমার ঈশ্বরের মত ক্ষমতাবান মনে হয়েছিল। আমি ওকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু পরদিনই জ্বর চলে গেলে আমার খুব অবাক লেগেছিল, আমার আগের রাতের মানসিকতায়। এটা কি করে সম্ভব হ'ল? আমার উত্তপ্ত ঠোঁটে অতনু তার ঠোঁট ছোঁওয়ালো? আর আমি আবেগে ওকে জড়িয়ে ধরলাম? মনকে বোঝাই, এটা একটা ঘটনা মাত্র।

কিন্তু সেদিনের চুম্বন অতনুর মনে যে এমন করে গেঁথে যাবে ভাবিনি। আর আমি? আমিই কি অস্বীকার করতে পারছি? ওর ওপরে আমারও তো কেমন মমতা এসেছে। রূপেনের সঙ্গে দেখা হ'লে আমার বুকের মধ্যেটা টাটায়। অনেক দিনের অনেক আকাশ, অনেক গাছ, অনেক পথ আমায় ছুঁয়ে যায়। সেই স্মৃতির টুকরোগুলো আমি মুছে ফেলি। কিন্তু ফের ফুটে ওঠে। এ যেন সেই শ্লেটের গায়ে খড়িমাটির দাগ। জলের ছোঁওয়ায় মুছে যায়। জল শুকোলেই আবার ফোটে।

রূপেনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমার চোখে পড়ে। কিন্তু কোথায় ওর সেই সাহস? ও আমায় কেড়ে নিতে পারল না কেন? ও অতনুকে দেখেই থমকে গেল? মনের দুর্বলতাকে আমি প্রশ্রয় দিই না। ভাবি, আমায় না পেলে রূপেন তো মরে যাবে না। ওর তো শ্রীময়ী আছে।

অতনুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার পর থেকেই আমি লক্ষ্য করছি শ্রীময়ীর সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতা বেড়েছে। বুঝতে পারছি না, এটা রূপেনের খেলা কিনা। আমায় জব্দ করার জন্যেই হয়ত ওর এই পরিকল্পনা। কিন্তু রূপেনের বাড়ি যেদিন যাই, সেদিন তো ওর

মা কতবার শ্রীময়ী শ্রীময়ী বলছিলেন। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, আমার চেয়ে শ্রীময়ী ও বাড়িতে বেশী পরিচিত।

ভাবি, শ্রীময়ীর প্রতি রূপেনের হয়তো এমন কোন দুর্বলতা আছে, যা ওকে এগুতে দেয় না আমার কাছে। রূপেনকে জড়িয়ে শ্রীময়ীর সঙ্গে আমার এই টাগ অব ওয়ার ভাল লাগে না।

অথচ মন টানে রূপেনের দিকে। রূপেনের সঙ্গে দেখা হলে বুকের মধ্যেটা টাটায়। বুঝতে পারি ওর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমার মন কেড়ে নেয়। কিন্তু কোথায় ওর সেই সাহস? ও আমায় কেড়ে নিতে পারল না কেন? স্বাস্থ্যবান ঝরঝরে তাজা যুবক। স্মার্টনেশের তো অভাব নেই এতটুকু। ও অতনুকে দেখেই থমকে গেল? মনকে আমি প্রশ্রয় দিই না। ভাবি, আমায় না পেলে রূপেন তো মরে যাবে না। ওর শ্রীময়ী আছে।

আমি জানি রূপেন আমায় ভালবাসে। ভালবাসা যদি নিভৃত মনের উপাসনা হয়, তবে সে ভালবাসা আমার থাকবে রূপেনের ওপর। সব অঙ্কই দুয়ে দুয়ে চার হয় না। তিনে একে চারও তো হয়। আমার চুম্বন যে পেতে পারত, সে রূপেন। কিন্তু ও পেল না। পেল অতনু। তবু অঙ্ক মিলল। আমার এই উনিশ বছর বয়সের যৌবন কুঁড়ির মধ্যে মাথা ঠুকছিল একজন সঙ্গীর অভাবে। রূপেন, অতনু, দীপঙ্কর, হীরক এত অসংখ্য........? সবাইকে নয়। আমার স্বাথপর মন শুধু একজনকেই চাইছিল। যাকে চেয়েছিলাম, তাকে পেলাম না। যাকে চাইনি তার সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। বুঝতে পারি না এরপর কি হবে? আমি কি পারব কোন শর্তের মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখতে? জানি না। নিজেকে একদম চিনতে পারি না।

"এই নাও, তোমার টিকিট। চল এক সঙ্গে যাই।" ভদ্রমহিলার কথায় আমি চমকে তাকাই।

"টিকিট হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"ধন্যবাদ।"

"থাক। আর ধন্যবাদ দিতে হবে না।"

উনি হাসেন। আমরা দু'জন পাশাপাশি হেঁটে যাই।

ইলেকট্রিক ট্রেনের ভোঁ বাজে। আমরা দৌড়ে গিয়ে লাগেজ ভ্যানেই উঠে পড়ি। ভেণ্ডারের ধাক্কা খেয়ে ঝুড়ি, ঝাঁপি, বস্তা মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমরা কোন রকমে শরীরটাকে ভেতরে গলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। গাড়ী ছুটে যায়।

মহিলাটি বলেন, "তুমি কোথায় থাক?"

আমি হেসে বলি, "ভবানীপুর।"

"তোমার মায়ের নাম কি বলত?"

মনে মনে ভাবি, বাবার নাম বাদ দিয়ে একেবারে মায়ের নাম? "নাম বললে, আপনি কি চিনবেন?"

থতমত খেয়ে ভদ্রমহিলা বলেন. "চিনতেও তে পারি।"

আমার ভাল লাগে না ওঁর এই গায়েপড়া আলাপ। আমি মায়ের নাম বলি না। চুপ করে থাকি।

বালীগঞ্জ স্টেশনে নেমে ঘোড়ার মত ছুট লাগাই। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি, ওই মহিলাও আসছেন। উনি হাত নেড়ে ইসারায় আমায় থামতে বলছেন। জ্বালাতন! আমায় দাঁড়াতেই হয়, টিকিট কেটে দেবার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়েই উনি আমায় ধরে ফেলেন। আমায় বলেন,"গড়িয়াহাট পর্যন্ত চল একসঙ্গেই হাঁটি।" "চলুন," আমরা দু'জনে চেকারকে টিকিট দেখিয়ে ওভারব্রিজে উঠি। "দারুণ গরম।" উনি বলেন। আমি বলি, "হ্যাঁ।" "একফোঁটা বৃষ্টি নেই।" "ক'দিন আগে তো প্রচুর হয়েছিল।" "হলেও....। তুমি কি পড় গো?" ইস্! আমায় ছাড়বে না দেখছি। বিরক্তি মিশিয়ে বলি, "পার্ট টু দিয়েছি।" "সায়েন্স না আর্টস, না কমার্স?" "সায়েন্স।"

"কোন কলেজে পড়তে?" "যোগমায়া।" "ভবানীপুরের কোথায় তোমার বাড়ি?" "আপনার দেখি আমার সম্পর্কে বিস্তব কৌতূহল। বিয়ের সম্বন্ধ করবেন বুঝি?" আমার কথায় মহিলাটি হেসে তাকান, "করতেও তো পারি।" আমি তবু হাসি না। উল্টে শুধোই, "পাত্রের বিস্তারিত বিবরণ বলুন?" 'কি রকম পাত্র তুমি চাও?" "আমি যেমন পাত্র চাইব, আপনি কি তেমন দিতে পারবেন?" "হয়ত পাবব।" আমার রাগ হয়। এমন নাছোড়বান্দা মহিলা দেখিনি। বলি, "এই এফ. আর. সি. এস. অথবা এঞ্জিনিয়াব, ব্যাঙ্ক অফিসার কিংবা উচ্চপদস্থ কোন সরকারী চাকুবে....।" "তুমি দেখি কাগজের বিজ্ঞাপন বলতে শুরু করলে?" "আমার ওপরে খুব বিরক্ত হয়েছ, দেখছি।"

কথা না বাড়িয়ে আমি ওকে ফেলেই এগোই।

বাটার সামনে দাঁড়ানোর কথা। ও নেই। আমাব তো মাত্র মিনিট পনেরো দেবী হয়েছে। এব মধ্যেই ও চলে গেল? বিশ্বাস হয় না। অতনুর অপেক্ষার ধৈর্য নেই। এখন আমি কি করি? ফুটপাথে এলোমেলো খুঁজি ওকে। পাই না। পাবলিক টেলিফোন বুথের কাছে এগিয়ে যাই। ফোন করে দেখলে হয়, ও বাড়ি ফিরে গেল কিনা? চেনা নাম্বারে ডায়াল করি। বিশ্রী খট্ খট্ আওয়াজ হয়। ফোনটাই খারাপ। ভারি রাগ হয় অতনুর ওপর। কোনদিন তো ও এমনি করে না। আজ আবার কি হল ওর?

আমি অনুমানে রাসবিহারীর দিকে এগোই। কাল সারাদিন, সারারাত আমরা কাটিয়েছি ডায়মণ্ডহারবারে। শুধু আমরা দু'জনে নই। শ্রীময়ী, রূপেন, হীরক, দীপঙ্করও ছিল। গঙ্গায় নৌকো চড়লাম। মাছধরা দেখলাম। মাঝিদের নৌকোয় ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাতও খেলাম। আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল সুন্দরবন যাবো। হ'ল না। শ্রীময়ীর খুব ভয়। ওর নাকি জলে ফাঁড়া। শ্রীময়ীকে আমরা খুব ক্ষ্যাপাই। বলি, "গঙ্গাবক্ষে নৌকো বিহারে

আপত্তি নেই। আপত্তি তোর সুন্দরবনে যেতে।" ও বলে, "না, ভাই। মাতলা নদী আমায় টেনে ফেনে নেবে।" "কোন নদীরই তোকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা নেই।" ওকে নিয়ে আমরা খুব হাসাহাসি করি। আমি বলি, "আমারও তো জলে ফাঁড়া। অথচ ভয় করে না তো ?" "তুই তো সাঁতার জানিস।" শ্রীময়ী বলে। রূপেন বলে, "ক্যালকাটা স্পোর্টসে সাঁতার কাটতে গিয়ে ও কটা খাবি খেয়েছিল ওকে জিজ্ঞেস করত ?" "থাক থাক, তোমায় আর ফোড়ন কাটতে হবে না।" আমি কৃত্রিম কোপে ঠোঁট ফুলোই। রূপেন হাসে।

জীবনে যখন প্রথম জলে নামি, তখন মনে হয়েছিল ডুবে যাব নাতো ? জলের মধ্যে জল খেতে খেতে খাবি খেতে খেতে এক সময় আবিষ্কার করলাম আমি বেঁচে আছি। বেঁচে থাকব। জল আমায় ডাকে। কিন্তু প্রাণ নেয় না। সেই থেকে সাহস বেড়ে গেল জলে নামার। জলে জলে বেড়িয়ে বেড়ানোর।

কিন্তু জলের দেশে যখন দরখাস্ত করলাম চাকরীর জন্যে তখন আর হ'ল না। আমার চাকরীটা হ'ল পাহাড়ে!

গঙ্গার ধারে মাঝিদের ঘরে ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে হু হু করে নদীর হাওয়া ঢুকছিল। ঘুমুবো কি! আমি তো বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে সারারাত বসেই কাটিয়ে দিই। আহা, এমন রাত কি আর কখনো জুটবে ভাগ্যে? আমার কয়েক হাত দূরেই ঘুমিয়ে আছে রূপেন। ঘুমুলে ওর নাক ডাকে। ওর লোমশ বুকটা ওঠানামা করে ওর শ্বাস প্রশ্বাসের ঢেউ-এ। শ্রীময়ীও ঘুমোয়নি। ও কনুইতে ভর দিয়ে তাকিয়ে আছে ওপরের দিকে। ও কি ভাবছে জানি না। অতনু দরজার পাশে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে। রূপেনের গলায় একটা স্টীলের চেন। চেনের লকেটে সাঁইবাবার মুখ। আজকাল ও খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে সাঁইবাবার। অতনু ভক্ত তিরুপতির। শ্রীময়ী কারো ভক্ত-টক্ত নয়। ও পুজোই বিশ্বাস করে না। আমি কালী-ঘাটের মন্দিরে হঠাৎ হঠাৎ ছুটে যাই।

আমাদের শোবার জন্যে মাঝিরা একটা মাদুর আর চট দিয়েছিল। তেল চিটচিটে বালিশ গোটা তিনেক। নিজেরা খড়ের গাদায় মাথা রেখে অতিথির জন্যে ছেড়ে দিয়েছিল তাদের মাথার বালিশ। আমরা আপত্তি করেছিলাম। কোন লাভ হয়নি। কিন্তু ওরা চলে যেতেই বাঁশের দরজাটা বন্ধ করে আমরা পায়ের গোড়ায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম ওদের সেই আন্তরিক যত্নটুকু। অতনু বলে, "আমার বমি আসছে।" শ্রীময়ী বলে, "আমারো। রূপেন বলল, "বেচারীরা মনে করল, আমরা বোধহয় কত খুশি হলাম ওদের বালিশ পেয়ে।" আমি খিলখিল করে হাসি রূপেনের কথায়। দীপঙ্কর খুব রেগে যায়। বলে, "তোরা লাগালি কি বলত? সেই বালিশেরই একটা মাথার তলায় দিয়ে হীরক সটান শুয়ে পড়ল। ও ভারিক্কী চালে বলল, "আমার কাছে হৃদয়ের দাম আছে।" আমরা চুপ করে যাই। আজকের এই উদ্দেশ্যহীন নির্মল আনন্দটুকু পাছে নষ্ট হয়! এখনই হয়ত মার্কস, লেলিন, হিটলার, ইন্দিরা গান্ধী, চরণ সিং এসে পড়বেন। চেয়ারম্যান মাও-সেতুংও রেহাই পাবেন না হীরকের কাছ থেকে।

অতনু কি পাহারা দিচ্ছে আমায়? বুঝতে পারছি না। ও কড়া প্রহরীর মত বসে রয়েছে আর উইলসের প্যাকেট ধ্বংস করে চোখের ঘুম তাড়াচ্ছে। হাসি পায়। অতনু কি দেখছে না শ্রীময়ীও জেগে? ও কি সারা জীবন ধরেই আমায় পাহারা দেবে নাকি? কিন্তু লখিন্দরের লোহার বাসর ঘরেও তো সাপ ঢুকেছিল! এ কথাটা যে কেন অতনুর মাথায় আসে না আশ্চর্য!

আমি আড়চোখে রূপেনকে দেখি। ও কেমন নিশ্চিন্তভাবে ঘুমুচ্ছে। বড় লোভ হয়, ওর বুকে মাথা রেখে এই মুহূর্তে ওকে জাগিয়ে দিতে। আমি তো অতনুর কাছে কোন দাসখৎ লিখে দিইনি। পরমুহূর্তেই চোখ চলে যায় অতনুর দিকে। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। অতনুর কাছে আমি যেন কোন এক অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ। আমরা দু'জনে কেউ কোন প্রতিজ্ঞা করিনি। কোন প্রতিশ্রুতি দিই

নি একে অন্যকে। তবু কোন এক অদৃশ্য নিয়তি আমাদের এক সুতোয় গেঁথে ফেলেছে। আমি জানি না আমার ভবিষ্যৎ। বুঝতে পারি না কোথায় গিয়ে থামবে আমার মনের মাঝি।

শাড়ীর দোকানের শো-কেসে, সাদা কালো হরেক পুতুলের গায়ে প্যাঁচানো শাড়ীর মেলা দেখতে দেখতে আমি হাঁটি। ভাবি আর একবার ফিরে যাব নাকি বাটার কাছে? দরকার নেই। তার চেয়ে একটা ট্-বি-তে উঠে পড়ি। বাড়িই ফিরে যাই। কাল না হয় ওকে একটা রিং করা যাবে। এইসব সাত পাঁচ ভাবছি, এমন সময় দেখি, সেই মহিলা যিনি সেই শেয়ালদা স্টেশন থেকে আমার পিছু নিয়েছেন! ওঁকে দেখেই আমি মুখ ঘুরিয়ে নিই। মহিলাটি হেসে বলেন, "আবার দেখা হ'ল তোমার সঙ্গে!" "দেখা হ'ল? নাকি আপনি দেখা করলেন?" "যদি বলি, দেখাই করলাম, তোমার তাতে আপত্তিই বা কেন?" "শুনুন, আপনার এই হেঁয়ালি আমার ভাল লাগছে না। আমি কড়া ধমক লাগাই। বলি, "আপনি স্পষ্ট খুলে বলুন, কি আপনার উদ্দেশ্য? আপনি কেন আমার পিছু নিয়েছেন?" "ছি, চেঁচিও না। তুমি কি পুলিশ ডাকবে নাকি?" "বাড়াবাড়ি করলে ডাকতেও পারি।" "যাহ্ বাব্বা!" উনি হাসেন। বলেন, "আচ্ছা, তোমার মায়ের নাম কি সোহিনী?" আমি আশ্চর্য হই। "আমার মাকে আপনি চেনেন? এতক্ষণ বলেননি কেন?" "তুমি বলার সুযোগটা দিলে কোথায়? তোমার নাম তো রূপ্সি।" "আপনি আমায় এত অবাক করলেন কি বলবো।" আমি হেসে ফেলি। "কিন্তু আপনার পরিচয?" "পরে বলছি। চল একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি রাজী হই। উনি কি মায়ের কোন বান্ধবী বুঝতে পারি না। যিনিই হোন, ভদ্রমহিলা দারুণ রহস্যময়ী।

হিন্দুস্থান কাফেতে গিয়ে বসি দু'জনে। "কি খাবে বল।" উনি খাবাবের মেনু সামনে এগিয়ে দেন। "কিচ্ছু নয়। শুধু এক কাপ কফি অথবা চা।" "তুমি বুঝি খুব চা খাও?" "তা একটু—আচ্ছা

আপনি কে তা তো বললেন না?" উনি হাসেন। বলেন, "বললেই তো ফুরিয়ে যাবে। ক্রমশ প্রকাশ্য।" আমি ঠোঁট কেটে হাসি। মজাই লাগে। উনিও হাসেন, বলেন, "এতক্ষণ তোমায় খুব ভুগিয়েছি তাই না?" "এখনও ভোগাচ্ছেন।" আমি হাসি।

দু'কাপ কফি আসে। আমরা কফির কাপে ঠোঁট ভেজাই। কফি খেতে খেতে বলি, "যাঁকে চিনি না, জানি না, তাঁর সঙ্গে কেমন কফি খেতে ঢুকে পড়লাম। এবং তাঁরই পয়সায়।" উনি বলেন, "মনে কর আমি কোন গোয়েন্দা।" কথাটা বলেই উনি হেসে ফেলেন। আমি কপট গাম্ভীর্যে বলি, "হলেও আপত্তি নেই। চোরাকারবারী নই যখন।"

পলিথিনের রেকাবিতে খানিকটা মৌরী, দু' কাপ কফির দাম লেখা বিলটা নিয়ে বেয়ারা এসে দাঁড়ায়। দু টাকার একটি নোট ফেলে দেন মহিলা। দু' কাপ কফির দাম। আমি এই প্রথম কোন বেয়ারাকে বখ্‌শিস্ না পেয়ে ফিরে যেতে দেখি। ভদ্রমহিলাকে দেখে তো মনে হয়, রেঁস্তোরায় ঢোকার অভ্যেস ওঁর আছে। অথবা এও তো হতে পারে, ব্যাগ ওঁর গড়ের মাঠ। আর কোন পয়সাই নেই? তাও কি সম্ভব? এই দুটো টাকা সম্বল করে উনি আমায় আরো কিছু খাওয়াতে চেয়েছিলেন? যদি আমি খেতেই চাইতাম?

ন'টা বেজে গেল। আর দেরী করা চলে না। ঘুম পাচ্ছে খুব। "শুনুন, আপনি এখনো বললেন না আপনি কে? আমায় তো এবার যেতে হবে।" "তোমার মা দার্জিলিং মেলে কোথায় গেলেন?" "এতদূর! আপনি আমার মাকে আজ দেখেছেন?" "দেখেছি, তোমার মা আমায় দেখতে পাননি। কোথায় গেলেন তোমার মা?" "দার্জিলিং।" "তুমি গেলে না কেন?" "ভাল লাগল না।" "তোমার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী কেমন?" "দেখুন, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।" "ও আচ্ছা।" উনি একটু থমকে যান। তারপরই বলেন, "আসলে কি জানো? তোমায় দেখে আমার খুব মায়া হচ্ছে।" "কেন?" আমি ভুরু কুঁচকোই।

উনি বলেন, "তোমার মা'র জন্য তোমার জীবনটা এত দুঃখের হ'ল। তোমার মায়ের অশুদ্ধ চরিত্র....।" "চুপ করুন। কি যা তা বলছেন। আমার মাকে আপনি কতটুকু জানেন?" "অনেকটাই জানি। আর জানি বলেই তোমায় সাবধান করে দিতে চাই....।" "থামুন। আপনি কে? কে বলুন?" "আমি তোমার নিকট-আত্মীয়া। তোমার বাবার মাসি।" "কে?" আমি ভূত দেখার মত চমকে উঠি। ইচ্ছে হয়, ওঁর পয়সায় খাওয়া কফি এই মুহূর্তেই বমি করে ফেলি। আমি উত্তেজিতভাবে বলি, "আমি সত্যি এবারে পুলিশ ডাকব। আপনি চলে যান, চলে যান বলছি। আপনাকে আমি ঘৃণা করি। আপনার জন্যেই আমার মাকে একদিন চলে আসতে হয়েছিল। আর আপনি এখন মিথ্যার মুখোশ পরে আমায় আমার মায়ের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছেন। বদ্‌মাশ, বেতমিজ"....জীবনে এই প্রথম একটা খারাপ গালাগাল আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। আমার উত্তেজনা তবু থামল না। আমার ইচ্ছে হ'ল, ওঁর গালে কষে একটা চড় মারতে।

তাড়া খাওয়া কুকুরের মত উনি পালিয়ে গেলেন। মিশে গেলেন ফুটপাথের ভিড়ের মধ্যে। আমার মনটা বিগড়ে গেল। আমি ভুলে গেলাম অতনুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। গতকাল এবং আজ সারাদিনের সমস্ত ঘটনা। এই মহিলাটির মুখ কেবলই আমার সঙ্গে সঙ্গে যেন চলতে লাগল। বুঝতে পারছি, শিকারী ব্যাধের মত আমি হিংস্র হয়ে উঠছি। বুঝতে পারছি না, এই মানসিকতা থেকে আমি কিভাবে অব্যাহতি পাই।

পরদিন অতনু আসে। ও বেশ রেগেই বলে, "কোন মানে হয়? ঝাড়া আধঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও তোমার পাত্তা নেই।" আমি বলি, "বাজে বকো না। আধ ঘন্টা মোটেও নয়।" অতনুর তবু মেজাজ যায় না। আমার ভাল লাগে না, এখনই আমার ওপরে ওর এতো অধিকার প্রয়োগ। গত রাতের ঘটনা আমায় এখনো ক্ষুব্ধ করে রেখেছে। তারপর আবার অতনুর এই মেজাজ। আমি ভেতরে

ভেতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠি। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে অতনু আরো রেগে যায়। ও ফের কৈফিয়ত চায়, "কাল তুমি কথা রাখোনি কেন বল? বল কাল তুমি যাওনি কেন?" "গিয়েছিলাম। দেরী হয়ে গিয়েছিল।" "তুমি আমায় ইচ্ছে করেই উপেক্ষা করছ রূপসি।" খুব ঠাণ্ডা গলায় বলে অতনু।

আমি যা নই তাই হয়ে উঠি। উপেক্ষা করার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও আমি ওকে উপেক্ষা করে উঠে যাই। ও একা বসে থেকে থেকে তারপর ভেতরের ঘরে যায় আমায় খুঁজতে। আমি তখন স্নানের আয়োজন করছি। কাল থেকে মাথায় জলই ঢালা হয়নি। ভাবছি, আজ শাম্পু করব কিনা।

বাথরুমে ঢুকতে যাব। অতনু বলে "শোনো।" ও আমার মায়ের শোবার ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে। "তুমি কি বাথরুম পর্যন্ত আমায় ধাওয়া করবে নাকি?" আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। অতনু বলে, "তোমার এই কুৎসিত প্রশ্নের উত্তর দেবার ভাষা আমার জানা নেই।" "অতনু" আমি বিকৃত গলায় চেঁচাই। আমার নিজের গলার স্বর আমি নিজেই চিনতে পারি না।

অতনু বেরিয়ে যায়। বাথরুমের দরজায় মাথা রেখে আমি হাঁপাতে থাকি। আমি আবার অনুভব করি, আমি একা। আমার কেউ নেই। কোনদিন ছিল না।

দু'দিন অতনুর কোন খোঁজই নেই। বুঝি, ও আজকাল মাত্রা রেখে চলতে শিখেছে। অতনু আর আগের মত নেই। আমার কাছে যে দিনগুলোয় ও অবজ্ঞা পেত, তখন ওর আত্মমর্যাদা বোধ এতখানি প্রবল ছিল না। আর আজ আমার সামান্য কথায় ও নিজেকে এত দূরে সরিয়ে নিয়েছে। ওর মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ থাকবে, পৌরুষ থাকবে এই তো আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু তবু আজ কেন আমার মন ওকে আর চাইছে না? আমার প্রশ্রয়, আমার ভালবাসা অতনুর নুয়ে পড়া মেরুদণ্ড সোজা করে দিল। অতনু একজন মেয়ের যথার্থ প্রেমিক

হতে শিখেছিল। কিন্তু সেই মেয়ে আজ ওকে প্রত্যাখ্যান করবে এও যে ভাবতে পারছি না।

তবু আমি নিরুপায়। অতনুর কাছে আর এগোন সম্ভব নয়। আমি বুঝতে পারছি অতনু এরপর আরো বাড়বে। ওর সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া জুলুম আমায় ভীত করবে। চিরকালীন পুরুষের সেই খবরদারী এই তো মেয়েরা চায়। মেয়েরা এটাকেই বলে পুরুষের পৌরুষ। কিন্তু আমার কেন আর ভাল লাগছে না অতনুকে?

অতনু হয়ত আমায় ভালবাসে। কিন্তু যে ভালবাসা অবুঝ, সেই ভালবাসার ওপর আমার বড় ভয়। আমি জানি, অতনু আমায় কোনদিনই বোঝেনি। ওর আছে শুধু অবুঝ ভালবাসা। আমার ওপরে অন্ধ আবেগ ছাড়া ওর আর কিছুই নেই। এই অন্ধ আবেগই তো মোহ। ও ছাড়া আমার যেন আর কেউ নেই, কোন কর্তব্য নেই। ওর জন্যে আমায় সব বিসর্জন দিতে হবে। অতনুর এই সর্বগ্রাসী ভালবাসার অত্যাচার আমি কি সইতে পারব? নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হবার সময় আমার এই। যদি ওর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাই, সেদিন আর সময় থাকবে না।

আমি আমার মায়ের মত জীবনটাকে নিয়ে খেলা করতে পারব না। আমার মায়ের দুজন স্বামীর মধ্যে কাউকে আমার পছন্দ নয়। আমি জানি, ওরা কেউই আমার মায়ের যোগ্য সঙ্গী নয়। আমি এই উনিশ বছর বয়সেই অনেক বুঝে ফেলেছি। আমার মায়ের দুই স্বামী বদলে আমার এই ধাক্কা খাওয়া জীবন আমায় আরো পরিণত করেছে। তাই আমি আজ এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি।

সামান্য প্রসাধন সেরে, শাড়ী বদলে আমি বেরিয়ে যাই। পাবলিক টেলিফোন বুথের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ব্যাগ খুলে ডায়াল করি অতনুর বাড়ির ফোন নম্বর। "হ্যালো!" ওদিক থেকে কথা ভেসে আসে। আমি পয়সার বাক্সে টুপ করে একটা আধুলি ফেলি। রিসিভার কানে চেপে বলি, "হ্যালো!" "হ্যালো! কাকে চাই?"

মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। ইনি কি অতনুর মা? নাকি বোন? বাড়ির কথা তো কখনই কিছু বলেনি অতনু। কখনও নিয়েও যায়নি ওর বাড়িতে। কে কে আছে ওর? জানি না। জানার প্রয়োজন নেই। আমি অতনুকে যেটুকু জেনেছি, আমার সেই জানাই যথেষ্ট।

"অতনু আছে?" "আছে।" "ডেকে দিন না।" "কে কথা বলছেন?" 'রূপ সি।" "ধরুন দেখছি।" বুঝতে পারি না, ওপাশের কণ্ঠস্বর সত্যিই অতনুকে ডেকে দেবে কিনা। ফিরে এসে যদি বলে, "নেই। এইমাত্র বেরিয়ে গেছে।" অসম্ভব কিছু নয়। বাড়ির ছেলের মেয়েবন্ধু থাকাটা এখনে অনেকে সুনজরে দেখেন না কিনা।

"এই অনু! অনু! তোকে কোন্ মেয়ে ডাকছে।" অনু! অতনুর নাম অনু? অনুর ভূমিকায় অতনু মানুষটা কেমন, সেকি বাড়ির ছেলে হিসেবে প্রিয় না অপ্রিয়? বুঝতে পারা গেল না। শুধু মনে হ'ল, যিনি ফোন ধরেছিলেন তিনি বোধহয় ওর মা। ওর মা মানুষটি কেমন? রূপেনের মায়ের মত ওঁর সর্বাঙ্গে বোধহয় মা মা ভাব মাখানো নেই। গলার আওয়াজ অন্তত সে কথা ঘোষণা করল। আমার নাম বলার পরও অতনুকে বলা হ'ল কোন মেয়ে ডাকছে?

ফোন ধরে অতনু। "হ্যালো! আমি অতনু বলছি।" "আমি রূপ্সি।"

ওপাশে নীরবতা। কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে যায়। আমিই বলি, "কি, কথা বলছ না যে?" "কি বলব?"

আমিই বা কি বলব বুঝতে পারি না। ঝোঁকের মাথায় অতনুকে রিং করেছি। কিন্তু ওকে কি বলব, তাতো গুছিয়ে নিই নি। সেদিনের ঘটনার আর কোন অভিযোগই তুলছে না অতনু। যদি তুলত তাহলে আমার পক্ষে সহজ হত কথা বলা।

"অতনু!" আমি ডাকি। "বল।" "একবার এসো তো, কথা আছে।" "আসবো।" সহজ উত্তর অতনুর। আমি কোন কথা না বলে ফোনটা নামিয়ে রাখি।

কিন্তু অতনু এলেই বা কি বলব, তাও তো জানি না। "আমি তোমায় বিয়ে করব না?" কি বোকা বোকা ব্যাপার। এ কথা বলার প্রশ্ন তো আসে না। আমরা বিয়ে করব এমন কোন শর্তই যখন আমাদের মধ্যে মৌখিকভাবে হয়নি। লিখিত তো হয়ইনি। একথা হয়েছে শুধু মনে মনে। আমরা একে অন্যের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়েছি যখন। টেলিফোন বুথের দরজার পাল্লা ঠেলে আমি বেরিয়ে আসি।

হাঁটতে হাঁটতে শুধু ভাবি অতনু এলে আমি কি বলব! আমার জীবনটা সহজ নয়। আমায় সংগ্রাম করেই যেতে হবে। জন্মলগ্নে কোন্ গ্রহের প্রভাব পড়েছিল জানি না। বোধ হয় রাহুর? একজন মেয়ে এবং পুরুষের মৈথুনে যে ভ্রূণের জন্ম হয়, তার জন্মমুহূর্তে কামাত মানুষ ত্ব'জন কি মুহূর্তের জন্যেও ভাবেন না সেই ভ্রূণের কথা? এই সন্তানের সুখ দুঃখময় জীবনে তাঁদের অবদান থাকবে কতখানি? আমার বাবা কল্যাণ সে কথা ভাবেননি। আমার মা সোহিনীও কি ভেবেছিলেন? জানি না। সোহিনী-কল্যাণ যে কথা ভাবেননি সেই কথা ভাবতে হবে তাঁদের মেয়ে রূপ্সিকে। অতনু আমার সন্তানের বাবা হবে কি না সে কথা ভাববার সময় আমার এসেছে।

বাড়ি ফিরে দেখি, রূপেন। রূপেন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার মনের মধ্যে তখন সার্কাসের ট্রাপিজের খেলা চলছে।

"তুমি কতক্ষণ?" মুখে হাসি টেনে আমি প্রশ্ন করি। রূপেন বলে. "তুমি যাবার পরই।" "মানে ক'টায়?" "যটায় তুমি গেছ?" ' ইয়ার্কি পেয়েছো?" আমি এতক্ষণে হাল্‌কা হই।

রূপেন বলে, "তারপর? এখন তো স্বাধীন। যা খুশি তাই করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ তোর হাতে।" রূপেন হাসে। অর্থপূর্ণ হাসি। আমার মনে হয়, ও যেন অতনু আর আমার মধ্যেকার কোন স্থূল সম্পর্কের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমায় ব্যাভিচারী ভাবছে রূপেন। ওর হাতে সিগারেট। সেই আগুনের ছ্যাঁকা লাগে যেন আমার বুকে। ওর হঠাৎ ছোড়া এই কথাটাকে হজম করতে আমার সময় লাগে।

বুঝতে পারি না রূপেনের চোখে আমি কি ?

"যা খুশি তাই করার ক্ষমতা মানে ?"

রূপেন হাসে। "কোথায় গিয়েছিলি বলত ?"

"তোর জেনে লাভ ?"

"তেমন কিছুই নয়। কড়া নেড়েই ভেবেছিলাম একটা হাসিখুশী ঝলমলে মুখ দেখতে পাব।"

"বাহ্, বাহ্, সুন্দর কমপ্লিমেন্ট। ঝলমলে মুখ।" আমি হেসে হাততালি দিই।

"কি খাবি বল ?"

'যা খাওয়াবে।'

আমার কানে খট করে বাধে কথাটা। ও আমায় তুমি বলল না ? হয়ত আমার শোনায় ভুল। আমি কাজের লোককে চেঁচিয়ে বলি, "দু কাপ চা।" রূপেনকে বলি, "মা আমার জন্যে ঘুগনি বানিয়ে রেখে গেছেন কাল। খাবি ?"

আমি ঘুগনি আনতে চলে যাই। যাবার সময় দেখি, রূপেন আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। রূপেনের এই চোখ আমি আর কখন দেখিনি। আমিও একটু অন্যমনস্ক হই। খানিক বাদে ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা ঘুগনী গরম করে দু প্লেট নিয়ে আসি। এক প্লেট আমি রূপেনকে দিই। আর এক প্লেট আমি নিই। রূপেন বলে, "তুমি দেখি শরৎচন্দ্রের নায়িকা হয়ে গেলে। খাইয়েই বাজীমাৎ।" "তুমি ?" আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাই রূপেনের দিকে। ও বলে, "আমার বুঝি তুমি বলা অপরাধ ? আর একজন তো দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে 'তুমি'।"

আমি বুঝতে পারি, "রূপেন অতনুর কথা বলছে।" "তুই যদি নিজেকে সেই পর্যায় ফেলতে পারিস।" আমি হেসে উঠি।

রূপেন বলে, "আমি খুব হিসেব করে সেন্টিমেন্ট খরচ করি।"

"তাই নাকি ? শুনে সুখী হলাম।"

"আচ্ছা, রূপ্সি, তোর সুখটা কতটুকু ?"

আমি দু হাতের আঙুল ছড়িয়ে শূন্যে একটা গোল এঁকে বলি, "এতটুকু।"

"আচ্ছা, রূপ্‌সি, তোর আকাশটা কত বড়?"

আমি বলি, "শূন্যে যতদূর চোখ যায়।"

"এতবড় আকাশ হ'লে সামলানো খুব মুশ্‌কিল।"

"তুই সামলাস কি করে?"

"তুমি যে ভাবে সামলাচ্ছো।"

রূপেনের কথায় আমি একটু চমকে যাই। আমার বুকের মধ্যে কি যেন ভেঙে চুড়ে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। বুঝতে পারি না, ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার সময় এই কিনা।

আমার মনের মধ্যে তখন সেই ট্রাপিজের খেলাটা চলতে থাকে। নাইলনের একটা সরু দড়ির ওপর দিয়ে আমি যেন সাবধানে হেঁটে চলি। দড়িটা দুলছে। আমার পা টলছে। নীচে অসংখ্য দর্শকের চোখ। আমি কি পারব এই খেলায় জিততে? আমায় দড়িটা পার হতেই হবে। পা ফস্‌কে পড়ে যাওয়া চলবে না। এখনই অতনু আসবে। আমায় রূপেন আর অতনুর সামনে সেই দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে।

চাপা উত্তেজনায় আমার মুখ লাল হতে থাকে। আমার অস্থিরতা প্রকাশ পায়। ঘুগনির খালি প্লেটটা টুলের ওপর রাখতে গিয়ে হাত ফস্‌কে পড়ে যায় মাটিতে। ঝন্‌ঝন্ করে বেজে ওঠে ভাঙা প্লেটের টুকরোগুলো। "এটা কি হ'ল?" আদুরে গলায় রূপেন আমায় ধমক্ মারে। আমি বলি, "কিছু না। আমায় একটা পরীক্ষা দিতে হবে। কঠিন পরীক্ষা। আমি তার প্র্যাক্‌টিস্ করছি।" রূপেন হাসে। বলে, "তার প্র্যাক্‌টিস মানে? পরীক্ষাটা কি কোন স্মৃতি-শক্তির?" আমি বলি, "না, মানসিক।" "মানে অনুভূতির ব্যাপার ট্যাপার কিছু?" খুব সহজভাবে রূপেন বলে। আমি একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই।

রূপেন কি বোঝে জানি না। ঘুগনির শেষ দানাটা পর্যন্ত চামচে দিয়ে খুঁটে মুখে পুরে ও আমায় বলে, "জল দেবে তো?" "চা দিয়েছি তো।" "সবার তেষ্টা কি চায়ে মেটে?"

আমি এক পলক ওকে দেখি। তারপর জল আনতে চলে যাই।

ঢক্ ঢক্ করে এক গ্লাস জল নিঃশেষ করে রূপেন আমায় খালি গ্লাসটা ফেরত দেয়। বলে, "জল আমার জীবন।" আমি হেসে বলি, "জীব জগতের কোন প্রাণী জল ব্যতীত বাঁচতে পারে না।" রূপেন আমার হাতটা ধরে ফেলে। ওর হাতের মধ্যে আমার হাত কাঁপে। রূপেন বলে, "বুঝতে পারো এ কথা?" আমি দুর্বল গলায় বলি, "কি?" রূপেন বলে, "এইমাত্র যা বললে।"

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বেলা এগারোটার ঘণ্টা বাজে। দরজার কড়া খট্ খট্ করে নড়ে ওঠে। অতনু এল বোধ হয়। আমার আর উত্তর দেওয়া হয় না রূপেনের কথার।

রূপেনকে দেখেই অতনু বলে, "তুমি?" ও এখন রূপেনকে তুমি বলে কথা বলে। আমার মনের মধ্যে ভুলে যাওয়া তার ট্রাপিজের খেলাটা ফের শুরু হয়ে গেছে। "কেন আমার আসায় অপরাধ হয়েছে নাকি?" সন্দেহজনকভাবে অতনু তাকায় রূপেনের দিকে। একটু হাসে। বলে, "সেকথা তুমিই বলতে পারবে।" রূপেন আর কথা না বাড়িয়ে বলে, "দে, দে, একটা সিগারেট দে। অনেকক্ষণ ধরাই নি।" অতনু ওর খদ্দরের গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। একটা সিগারেট রূপেনকে দেয়। নিজেও একটা ধরায়। দেশলাইটা ছুঁড়ে দেয় রূপেনের দিকে। রূপেন নতুন করে কাঠি না জ্বালিয়ে নিজের মুখটা এগিয়ে নেয় অতনুর দিকে। ওর ঠোঁটে গোঁজা জ্বলন্ত সিগারেটটা থেকে নিজের ঠোঁটেরটা ধরিয়ে নেয়।

রূপেন বলে, "রূপ সি, তুমিই বা নীরব দর্শক হয়ে থাকবে কেন? একটা ধরিয়ে নাও।" আমি বলি, "ধরালেই ধরানো যায়। এতে কোন বাহাদুরী নেই।" অতনু বলে, "মেয়েদের মুখে সিগারেট বিশ্রী,

বেমানান।" রূপেন বলে, "যা, যা, আর জ্যাঠামো করিস না। ছাখ, অতনু, মনে কোন প্রেজুডিস রাখিস না। ঠকবি।" অতনু তবু দমে না। বলে, "প্রেজুডিস আমার নেই। তবে রূপসির ঠোঁটে? ....ভাবা যায় না।"

"কেন ভাবা যায় না অতনু?" আমি ওকে অবাক করে দিয়ে ওর উইলসের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে চট করে ধরাই। গল্ গল্ করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলি, "খুব খারাপ দেখাচ্ছে অতনু?"

অতনুর মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধূমপান চলে তিনজনেরই। রূপেনকে খুব খুশি খুশি দেখায়। আমি বুঝতে পারি। আমার কেমন ঝোঁক চেপে যায়। আমি একটা শেষ করে আর একটা ধরাই। অতনু বলে, "এটা তোমার বাড়াবাড়ি।" রূপেন হেসে প্যাকেটটা আমার আর একটু কাছে ঠেলে দেয়। বলে, "আরও একটা চলবে নাকি?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অতনু। বলে, "আমায় কি এজন্যে ডেকে আনা হয়েছিল?" আমি বলি, "কি জন্যে?" অতনু বলে, "এই আর একজন তৃতীয় ব্যক্তির সামনে অপমানের জন্য?" আমি বলি, "ছিহ্, অতনু। তুমি কি যা তা বলছ?" "আমি ঠিকই বলছি।" উত্তেজিত অতনুকে রূপেন হাত ধরে বসিয়ে দেয়। বলে, "তুই এত অল্পে চটিস কেন? সহজভাবে সব কিছু নে। আনন্দ পাবি।" "যা যা, তুই আর আমায় অ্যাডভাইস দিস্ না। অতনু রূপেনের হাত ছাড়িয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি হাঁ করে চেয়ে থাকি, ওর চলে যাওয়া পথের দিকে। আমারই তৈরী আজকের এই অতনু।

কিন্তু আমি কি ওকে এভাবে গড়তে চেয়েছিলাম? এর নাম কি পৌরুষ? ও যে একটা কৃত্রিম পৌরুষের মুখোশ পরে আমায় ওর অধীনস্থ করে রাখতে চায়। যে শুধু চোখের জল ফেলবে। আর পৌরুষহীন পুরুষের পুজো করে যাবে।

যে কথা ওকে বলব বলে আমি ডেকে এনেছিলাম সেই কথা আমার ওকে বলা হল না। কি বলতাম? কিভাবে বলতাম? আমি সেই সমস্যায় ভুগছিলাম। রূপেন এসে আমার সেই সমস্যার সমাধান করে দিল। অতনুর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই থাকবে না আমি জানি। অতনু পরিষ্কার বুঝে গেল, আমার কাছে ওর থেকে রূপেনের দাম বেশী।

ভালই হল। বৃষ্টিভেজা একদিন রাত্রের কিছু কৃতজ্ঞতা দেখাতে গিয়ে নিজেকে হয়ত ক্ষয় করে ফেলতে হত। দুর্বল মুহূর্তের একটা চুম্বনের মূল্য দিতে গিয়ে আমার মায়ের মতই হয়ত আমার পরিণতি হ'ত।

কিন্তু রূপেন? ওই কি আমাব সেই মনের মানুষ? ওকে যাচাই করার সময় আমার এখনো আসে নি। ও যে শ্রীময়ীর রূপেন। ওকে কেড়ে নেবার অধিকার আমার নেই।

ট্রাপিজের খেলায় আমি সাবধানে এগিয়ে যাই। আমি সফল হই। আমি যেন দর্শকের হাততালি পাই। বুঝতে পারি না, অত হিসেব করে জীবনে চলা যায় কিনা! চলা উচিত কিনা!

রূপেনের জন্যে মন কাঁদে।

অ্যাসট্রেতে ফেলে দিই হাতের আধপোড়া সিগারেট। ওটা নেভে না। জ্বলে যায়। জ্বলতে থাকে। আমি আঙুলে টিপে ফের ওকে নেভাই। রূপেন কিছু বলে না। ও শুধু তাকিয়ে দেখে।

আগের মত দু'জনের কথা আর জমে না। আমার শিথিল দেহ চেয়ারে এলিয়ে থাকে। রূপেন এখন ইচ্ছে করলে আমায় হয়ত অনেকখানিই পেতে পারে। কিন্তু ও এগিয়ে আসে না।

আমি চোখ বুজে অপেক্ষা করি, একটি দুর্লভ চুম্বনের। হয়ত এগিয়ে আসবে রূপেন। আমি এই প্রথম অনুভব করি, একটি পুরুষকে আমি ভালবেসেছি। আমার এই প্রিয় শরীর, আমার এই ভালবাসার মন আমি একজনকেই সঁপে দিতে পারি। আমি রূপেনের স্ত্রী হতে চাই। রূপেনের সন্তানের মা হতে চাই। আমার স্নেহের ঘরে মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করতে চাই।

"রূপেন।"

"উঁ।" ঘুমের মধ্যে থেকে যেন জেগে ওঠে রূপেন। পাশের দোকানের কামারের লোহা পেটার শব্দ আসে ঠক্ ঠক্ ঠক্। মনের মধ্যে ভেসে ওঠে শ্রীময়ীর মুখ। আমার উৎসাহের ঘরের আলো নিভে যায়। তবু ডাকি, "আই রূপেন!" আমার এ ডাকের মানে কি রূপেন বোঝে না? আমি খুব অসহায় বোধ করতে থাকি। বুঝতে পারি, আমি মরেছি। ওই একজনকে পাবার জন্যে আমায় লড়তে হবে। ওকে লড়াই করে কেড়ে নিতে হবে শ্রীময়ীর হাত থেকে। কিসের জোরে আমি লড়ব? সে জোর কি দেবে রূপেন?

ও কি এখন শ্রীময়ীর কথা ভাবছে? বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে ওঠে, রূপেনকে আমি কতটুকু জানি? হয়ত আমার চেয়েও শ্রীময়ী ওকে অনেক বেশী জেনেছে। জানিনা কোন প্রতিশ্রুতি, কোন বিবেকের দংশনে জ্বলছে এখন রূপেন।

বিকেল ফুরিয়ে আসছে। মেঘে মেঘে গেরুয়ারঙের আলো। একেই তো বলে কণে দেখা আলো। এই আলোয় রূপেন একবার মুখ তুলে দেখুক আমায়। কেন তবে দুর্বল করেছিল এই কিছুক্ষণ আগে? বুঝতে পারি না, ওর মধ্যেও কোন ট্রাপিজের খেলা চলছে কি না? ও কি সফল হবে? না পড়ে যাবে? কে ওকে টেনে নেবে—আমি? না শ্রীময়ী?

দুহাতে মাথা গুঁজে বসে আছে রূপেন। ওকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে আকাশের ওই এলামাটির রঙে। মনে হচ্ছে একটা ক্যালেণ্ডারের ছবি। আমার বাবা, মার বিয়ে হয়েছিল গোধূলি লগ্নে। শ্রীময়ীর সঙ্গে যুদ্ধে আমি পারব না। রূপেন যদি আজ ভুল করে আমার হাতে হাত রেখে বসে? শ্রীময়ী আমার বন্ধু। অনেকদিনের। একবার ওর জন্যে আমি কেঁদেছিলাম, আড়ি করে সাত দিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি বলে। আজ যদি তার প্রতিশোধ নিই? আমার মা প্রতিশোধ নিতে পারেনি মিলিমাসির ওপরে। আমার বাবার মাসি জিতে গেছে। আমিও জিতিয়ে দিই শ্রীময়ীকে?

ক্যালেণ্ডারের ছবিটা যেন নড়ে ওঠে ।

রূপেন তাকায়। আমি একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিই। ও যে শ্রীময়ীর রূপেন। রূপেন কিছু বলবে হয়ত। আমি দেওয়াল ঘড়ির বাজনা শুনি। কিছুই বলে না রূপেন। ওর মধ্যে কেন এত দ্বিধা ?

চড়াইভেঙে যদি কোনদিন ও আমার কাছে পৌঁছোয়, সেদিন আমি হাত বাড়িয়ে দেব।

আজ থেকে আমি দিন গুনবো, বছর গুনবো। আমার রূপ, আমার রূপেন যদি কোনদিন আমার কাছে এসে পৌঁছোয়! ওর মনের যুদ্ধ শেষ হোক। যুদ্ধের শেষে যদি দেখি, শ্রীময়ী জিতেছে, তবে ওকে আমি অভিনন্দন জানাব।

আমি কি অতনুকে প্রতারণা করছি? মনে হয়, না। এর নাম বোধহয় প্রতারণা নয়। ওকে তো আমি কোন কথা দিইনি। বুকের মধ্যে ইঁটের বোঝা বয়ে বেড়ানোর চেয়ে বোঝা ফেলে হাল্‌কা হওয়াই ভাল। অতনুকে আমি কেন ফাঁকি দেব? আমি তো ওর শুভাকাঙ্খী। আমি ওর বন্ধু।

"আমি তোমাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলাম না তো?" ফেরীঅলার ক্লান্ত গলার স্বরের মত শোনায় রূপেনের প্রশ্ন। চোখের কোণে হেসে আমি ওকে দেখি। আমার সে হাসির জবাব দেয় না রূপেন। আমার কানের মধ্যে রূপেনের কথাটা বেজে যায়।

সারাদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশে কালো মেঘ। পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাসে চেপে আমি আর রূপেন একবার এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম বেড়াতে। প্রকাণ্ড বাড়িটার ছাদে দাঁড়িয়ে আমরা আকাশে প্লেন ওড়া দেখেছিলাম। রানওয়ের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কেমন করে দৌড়ে গেল প্লেনটা। দৌড়তে দৌড়তে আকাশে হাওয়া। ছাদের কার্ণিশে ভর দিয়ে রূপেন বলেছিল, "ছাখ রূপ্‌সি, আমরাও না ওই একেকটা প্লেনের মত। প্রথমে হাঁটি। তারপর

দৌড়োই। তারপর উড়ি।" আমি বলি, "হুঁ। তা রূপেনবাবুর আমার সঙ্গে এখন হাঁটা না দৌড়নোর পালা?" রূপেন হেসে বলেছিল, "কি মনে হয় তোর?" আমি এখন আকাশে প্লেনের পাখা ওড়া দেখি। আর হুংকার, গর্জন শুনি। দুচোখের লাল আলো দুটো নিয়ে সে যেন আমায় শাসায়।

রূপেন কি উড়ে যাবে নাকি? আমি দেখতে পাই কক্‌পিটে পাইলটের হাসি।

জানলা দিয়ে চোখে পড়ছে সামনের পার্কটা। অনেকগুলো বাচ্চার মুখ। রাংতা মোড়া সোনালী চকলেটের হাসি। ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের পাতার মত মনটা যেন কোথায় ছিট্‌কে চলে যায়।

আমি দেখি, একটা ছোট্ট বাচ্চা খেলার জন্যে কি ছট্‌ফটই না করছে। তার কোন খেলা নেই। তার মুখে হাসি নেই। আমার কি আবার কোনদিন দেখা হবে বাবার মিলিমাসির সঙ্গে? ভদ্রমহিলাকে যে আমার অনেক জেরা করা বাকী।

স্লিপ কাটছে পার্কের বাচ্চারা। আমি কোনদিন পার্কে গিয়ে স্লিপ কাটিনি ওদের মত। বাবার পাঞ্জাবীর পকেট ধরে খুব বেশীদিন বোধহয় আব্দার করিনি, "আমি লজেন্স খাবো বাবা।" ট্রাই সাইকেলটা যেদিন কিনে দিয়েছিলেন বাবা, সেদিনের কথা আমার একটুও মনে নেই কেন? আমার স্মৃতিশক্তি এত কম, এত কম কেন?

আমি আমার সেই ছোট্ট মুখটাকে আদর করতে চাই। হাতড়ে মরি। বুকভরা স্নেহ উজাড় করে ঢেলে দিতে চাই, সেই ক্ষুদে মানুষটাকে যার সোনালী দিনগুলো খরচ হয়েছে মা বাবার ঝগড়া দেখে।

আজ যদি নবজাতক হতাম! এই মা নয়, এই বাবা নয়, অন্য কোন পরিচয়ে বড় হতাম! অনাথ আশ্রমে পরিচয়হীনা শিশুর দলে ভিড়ে গিয়ে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরী করতাম! চোখের জলের ভেতর দিয়ে জীবন শুরু হলেও সে চোখে রক্ত ঝরত না এমন করে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে যায় রূপেন। আমায় বলে, "রূপ.সি, যদি কোন-

দিন তোর কোন কাজে লাগে তো আমায় ডাকিস। বাই।" হাত নেড়ে চলে চায় রূপেন।

জীবনটা যেন একমুঠো ধূলো। কত সহজে ঝেড়ে ফেলা যায়।

রূপেন চলে যায়। আমি একটা মোমের পুতুল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি।

আমি এক সময় হাঁটি। আমি যেন হাঁটছি তো হাঁটছিই। বালির চর, বালির সমুদ্র ভেঙে হাঁটছি। কোথাও এতটুকু জল নেই। মরূদ্যান নেই।

আমার জন্মমুহূর্তে কেউ শাঁখে ফুঁ দিয়েছিল কিনা সে কথা আমার জানা নেই। আমি জানি না, আমার মুখে ভাতে প্রদীপ জ্বলেছিল কিনা।

আমি লক্ষ শিশুর জন্মমুহূর্তের শাঁখের আওয়াজ শুনি। আমি লক্ষ প্রদীপের আরতি দেখি। লক্ষ শিশু তার বাবা মায়ের হাত ধরে পার্কে চলে যায়। তারা হাসে। সে হাসি বিজ্ঞাপনের হাসির মত নয়। কতক্ষণ সেই ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি জানি না। সন্ধ্যের আলো জ্বলে ওঠে।

মা নেই। ক'দিন ধরে বাড়িটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। এ যেন এক প্রকাণ্ড ডাকবাঙলো। যেখানে আমি একা। বেড়াতে এসেছি। ক'দিন পরই চলে যাব। ভবানীপুরের এই ঘিঞ্জি গলিটা আমার কাছে এখন অন্য খবর নিয়ে আসে। রূপোর থালার মত এখানেও আকাশে চাঁদ ওঠে। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই একটা শিউলী ফুলের গাছ। এক পুরনো বাড়ির পাঁচিলের পাশে অনেক দিন থেকে অযত্নে পড়ে আছে গাছটা। ছাদে দাঁড়িয়ে আমি রোজ সকালে সেই গাছের মাথা দোলানো দেখি। নিজেকে আগন্তুকের মত এ বাড়িতে ভাবতে বেশ লাগে।

একা একা সময় মন্দ কাটে না। রূপেন আর আসেনি। অতনু, দীপঙ্কর, শ্রীময়ী কেউ না। ওরা তো জানে, আমি চলে যাব। তবু কেন আসে না?

আমি অতনুকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আর রূপেন? ও বোধহয়

নিজেকেই ভয় পায়। কিন্তু আর বাকী সবাই ? শ্রীময়ী হয়ত চালাচ্ছে ওদের। যদি পুরনো আড্ডা আমায় আর রূপেনকে ফের এক করে দেয় ? আমি তো পছন্দই করছি। এই দল ছাড়া জীবন।

যেদিকে যাই মায়ের গায়ের গন্ধ ছড়ানো। বিছানাপত্রে, আলনার কাপড় চোপড়ে, আমার পড়ার টেবিলে।

আমার কঠিন হাতের মুঠো গলে আমি বেরিয়ে আসি। নিজেকে যেন আজ চিনতে পারি। যতটা নিষ্ঠুর ভেবেছিলাম, ততটা নিষ্ঠুর আমি নই।

আলনা থেকে টেনে নিই, মায়ের ছেড়ে রেখে যাওয়া কাপড়টা। বুকে চেপে ধরে মায়ের প্রতিনিধিকে ফিস্‌ফিস্ করে বলি, "তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভালবাসা।" আমি তার গন্ধ শুঁকি। আদর করি।

অনেক দূর থেকে ছুটে আসছে টুপ্‌সি। "দিদি, দিদিরে, রান্না পাটি খেলবি ?" আমাদের বাবা আলাদা হলেও মা তো একই। মায়ের রক্তস্রোত যে আমাদের দুজনেরই শিরায়, ধমনীতে!

টুপ্‌সির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল একবার একটা রেলগাড়ী নিয়ে। মা এনে দিয়েছিলেন ওকে। আমায় দেননি। আমি তো বড় হয়েছি। তবুও হিংসে। মা, আমার মা ওকে দেবেন কেন ? আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম ওর গাড়ীটা। টুপ্‌সি কেঁদেছিল। আমার বুকের মধ্যে এখন সেই রেলগাড়ীর ঝামর ঝামর শব্দ। হরিণ শিশুর মত টুপ্‌সির অসহায় কান্না।

চলে যাবার সময় রেলগাড়ীর জানলায় মার চোখদুটো আটকে ছিল। "অন্ধকে চক্ষুদান করুন।" আইব্যাঙ্কের গায়ে লেখা। দুনিয়ার সব মানুষগুলো অন্ধ। আমার মা তাদের চোখ দিতে পারেন। সে চোখ আঁটা থাকে বুকে। আমার মা সেই চোখের যাদুকর।

আমার জন্যে অনেক টাকা গচ্চা গেল মার। দার্জিলিঙের আসা যাওয়ার টিকিটের দাম। যাক্। আর তো যাবে না। আমার জন্যে এই শেষ খরচের কাঁটাটুকু মার বুকে বিঁধে থাক। কিন্তু তার চেয়েও

যে ক্ষতি করে দিলাম আমি মায়ের। এই দুঃসাহস দেখিয়ে, যখন পৌঁছুবে ওঁর কাছে ছোট্ট সেই খবরটা? আমি নাগাপাহাড়ে চলে গেছি চাকরী নিয়ে?

সেখানে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটানো হচ্ছে। অন্ধকার গভীর জঙ্গল। গাছের ঝুপড়ির মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো কৃপণের মত এসে পড়ে বনেব পথে। এখন সেখানে ডিনামাইটের আওয়াজ। রাস্তা তৈরী হচ্ছে পাথব কেটে। মিলিটারী হেডকোয়ার্টার উঠছে। নতুন একটা হেলথ সেণ্টার হয়েছে। সেখানেই আমার কাজ। সেখান থেকে শহর অনেক দূরে। সপ্তাহে একদিন জীপ যাবে কোহিমায়। সেই জীপে কবে আমি শহরের মানুষ দেখতে যাব।

বুনো জন্তুগুলো নাকি এখনো চেঁচায় সেখানে দিনরাত। আমি শুনবো, জঙ্গলেব হাহাকার। সেই জন্তু, জঙ্গল নিয়ে আমি অবশ্য খুব ভাল থাকব'না। আমি জানি, মানুষের মুখ দেখার জন্যে আমি কি ভয়ানক পাগলামী করব। হয়ত সেখানকার গাছের গায়ে, পাথবেব চাঁইয়ে আমি রূপেনের নাম লিখে বেড়াব। আমার মায়ের নাম লিখব। আমি আমার বন্দী জীবনের একেকটি দিন একেকটি বছরের মত কাটাব।

তবু সেই হবে আমার বেঁচে থাকা।

টিকিটের টাকা, কেনাকাটা নিয়ে অনেক টাকার ধাক্কা। কোথায় পাই এতগুলো টাকা? জগুবাবুর বাজারের কাছে একটা দোকান আছে। তার গায়ে লেখা, "এখানে সোনা রূপার গহনা বন্ধক লইয়া টাকা দেওয়া হয়।"

আমি তাকাই আমার হাতেব বালাজোড়ার দিকে। এই তো সহজ উপায়।

দোকানদার বলে, "মাসে মাসে সুদ দিতে হবে। সুদ বন্ধ হলেই গয়না আটকে যাবে।" কালো মোটা-সোটা মানুষটা। দোকানদারের একটা দাঁত সোনার। সেই সোনার দাঁতে হাসির ঝিলিক কেটে লোকটা বলে, "বালা জোড়া ছাড়িয়ে নেবার তিনদিন আগে নোটীশ দিতে হবে।"

"আমি যদি বাইরে থেকে মানে কলকাতার বাইরে থেকে মনিঅর্ডার করে সুদের টাকাটা পাঠাই ?"

লোকটা খুব অবাক হয়। তাকায়। বলে, "যে ভাবেই হোক টাকাটা পেলেই হ'ল।"

"আপনার নামটা বলুন।"

"রমেশ চন্দ্র কর্মকার।"

আমি বালা জোড়া হাত থেকে খুলে দিই। লোকটা ওজন করে বলে, "দেড় ভরি।"

"সেকি ! এতে তো দু ভরি ছিল।"

"খানিকটা ক্ষয়ে গেছে।"

"কি করে গেল ? আমি ছিনতাই হবার ভয়ে আজকাল আর সোনা বিশেষ পরি না।"

"আজকাল না পরুন, কদিন আগের কালে তো পরেছিলেন। তখনই ক্ষয়েছে।"

"কদিন আগের কালে মানে ? সে আর কদিন ?"

"বেশ তো আমার কথা বিশ্বাস না হয়, ওজনটা দেখুন।"

লোকটা ওজন করে। আমি তোলা, নিক্তির ওজন বুঝি না। বোকার মত তাকিয়ে থাকি পেতলের ছোট্ট দাঁড়িপাল্লার দিকে।

"শুনুন, গালাটাকে বাদ দিতে হবে। তাহ'লে আপনি পাবেন"....।

বারো শো টাকা আমার হাতে তুলে দেয় লোকটা।

আমি ঠকেছি, না জিতেছি বুঝতে পারি না। শুধু একশো টাকার নোটগুলো হাতে নিয়ে আমার টাকার প্রেমে পড়ে যাই।

লোকটা বলে, "একশো টাকায় পাঁচ টাকা সুদ।"

"আমার রসিদ ?"

"রসিদ তো হয় না দিদি। মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে দিয়ে যায়।"

টাকাগুলো ব্লাউজের বুকে ব্যাগের মধ্যে রেখে হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম লাইন পার হই। ভাবি, লোকটা যদি পরে অস্বীকার করে আমায় টাকা

দেয়নি বলে ? ইস ! মা বোনাসের টাকায় গড়িয়ে দিয়েছিলেন বালাটা !

একটা ফাইভারের স্যুটকেসে আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিই। কিছু টুকিটাকি জিনিস এখনো কেনা বাকী। যেমন, একটা বেড্‌সীট, তোয়ালে। গোটা দুয়েক সায়া আর ব্রা। এগুলো বেডিংয়ের মধ্যে নিয়ে নেব। এখনো টিকিট কাটা বাকী।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের সিটি অফিসে মিনতি মাসি আছেন। মিনতি দাস। আমায় খুব ভালবাসেন। মিনতি মাসি কি এখনো এনকোয়ারীতে আছেন ? জানি না।

হরিশ মুখার্জী রোড থেকে আমি একটা ন নম্বর বাস ধরি। হু হু করে বাস ছোটে। আমার কলকাতার জন্যে মন পুড়তে থাকে। বুঝতে পারি, এই ট্রাফিক জ্যাম, লোকজন, ভিড় ভাট্টা আমি কত ভালবাসি। এই কলকাতা ছেড়ে আমায় যেতে হবে বহুদূরে।

শ্রীময়ী আমার কাছে দশটা টাকা পায়। মনে ছিল না। ফেরার সময় দিয়ে যেতে হবে। ওকে কি এ সময় পাব বাড়িতে ? আগে তো সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুর সিটি অফিসে যাই। তারপর ওর কাছে যাওয়া যাবে।

এনকোয়ারীর কাছে দিলীপ মেসোর সঙ্গে দেখা হয়। মিনতি মাসির স্বামী। উনিও ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌স-এ আছেন। গ্রীসিয়ান ফিগার, দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা। দিলীপ মেসো বলেন, "কি খবর, এখানে ?"

"একটা গৌহাটীর ফার্স্ট ফ্লাইট।"

"কবেকার ?"

"পরশুর।"

"হয়ে যাবে। তিনতলায় মিনতির কাছে যাও। শোনো, কার জন্যে এসেছ টিকিট নিতে ?"

"আমারই।" আমি বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বলি।

"তুমি একা ? কার কাছে যাচ্ছো সেখানে ?"

"একটা চাকরী পেয়েছি।" কথাটা বলেই আমি তাড়াতাড়ি বলি,

"আপনার শরীর খারাপ হয়েছিল কেমন আছেন?"

"ভাল নেই। হাইপ্রেসার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, এইসব নিয়ে বেঁচে আছি।"

মিনতি মাসির সঙ্গে দেখা হয় তিনতলায়। আমার মায়ের অনেক দিনের বন্ধু মিনতি মাসি। আমায় দেখে হেসে বলেন, "কিরে তুই একা? না সোহিনীও এসেছে?"

আমি কথা ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি বলি, "আমায় একটা টিকিট ম্যানেজ করে দেবে? গৌহাটীর। পরশুদিনের ফার্স্ট ফ্লাইট।"

চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে হেসে তাকান মিনতি মাসি। স্নেহময়ী চাউনি ছুঁড়ে বলেন, "কে যাবে রাহুল বাবা?"

"উঁহু।"

"তবে কে?

"বলত, কে?"

"মা?"

"আমি।"

"তুই? তুই কোথায় যাবি পাগল?"

মা আর আমার সম্পর্কের অনেক কথাই জানেন মিনতি মাসি। তাই বলেন, "মার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?"

"মোটেও না। আমি একটা চাকরী পেয়েছি।"

"কোথায় গৌহাটীতে? ওরে পাগল! তোর মা ছেড়ে দিচ্ছে তোকে? দাঁড়া, তোর মাকে এক্ষুনি বকুনি লাগাই। তোর মায়ের অফিসের ফোন নম্বর কত?"

"মা এখানে নেই। দার্জিলিং।"

"তোর যাবার সময়টাও মা থাকতে পারল না?"

"আমার জন্যে কেউ চোখের জল ফেলুক আমি তা চাই না মিনতি মাসি। আমায় যেতেই হবে, নইলে আমি নিজের পায়ে দাঁড়াব কি করে?"

"বাহ্। চমৎকার লম্বা চওড়া লেকচার। তুই সত্যি বড় হয়ে

গেছিস রূপ্‌সি।" মিনতি মাসির চোখ দুটো ছল্‌ ছল্‌ করে। আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, "এই মাসিটাকে কখনও ভুলিস নারে।"

টিকিট পেয়ে আমি আর দাঁড়াই নি মিনতি মাসির কাছে। পাছে ধরা পরে যাই ওঁর আরও জেরায়? যদি জানতে পারেন, মাকে না জানিয়ে আমি চলে যাচ্ছি দূরে! তুখোড় স্মার্ট, মিষ্টি চেহারা মিনতি মাসির চোখ ফের মিটিমিটি হাসে।

"তোর মা কালই ফিরছেন তো?"

আমি হ্যাঁ কি না কিছুই না বলে শুধু মাথা নেড়ে ছুট লাগাই।

শ্রীময়ীদের দরজায় বেল টিপে দাঁড়াই। ভেতর থেকে আই দিয়ে দেখে শ্রীময়ী দরজা খোলে। "আরে, তুই? আয়, আয়।" ও সহজ হতে গিয়েও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। শ্রীময়ী বলে, "রোজই ভাবি, তোর কাছে যাব, মামু, মাসিরা এসেছিলেন বর্ধমান থেকে....।"

"তোর টাকাটা নে শ্রীময়ী।" আমি ব্যাগ খুলে দশ টাকার নোটটা মেলে ধরি।" "এখনই নিতে হবে? তোর আর ঘুম হচ্ছিল না বুঝি?

আমি শ্রীময়ীর চোখে চোখ রাখি। কিছু বলি না। ফেরার জন্যে পা বাড়াই।

"কিরে এখনি যাবি কি? ভেতরে আয়, বোস্‌।"

"আমার খুব তাড়া।" আমি পা চালাই।

সাপখেলা দেখেছিলাম। সাপুড়ের বাঁশীর তালে তালে সাপটা নাচছিল। ফণা দুলিয়ে নাচার সময় ওর চোখে হাসি দেখেছিলাম। ফুটপাথে ভিড়। লোকে লোকারণ্য। সবাই সাপের নাচ দেখছিল। আমি দেখছিলাম ওর চোখের হাসিটা।

শ্রীময়ী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে, "এয়ারপোর্টে যাব তোকে সি অফ করতে।"

একটা তীব্র কৌতূহলে আমি পিছন ফিরি। দেখি, শ্রীময়ীর চোখে সেই সাপের চোখের হাসি। আমার আর জিজ্ঞেস করা হয় না, কে কে যাবে এয়ার পোর্টে?

চিঠির বাক্স খুলে বিকেলের ডাকে মায়ের একটা চিঠি পাই। এক খানা পোস্টকার্ডে কুটি কুটি করে লেখা কত যে কথা! আমায় সাবধানে থাকার হাজার উপদেশ। আমি কি বড় হইনি নাকি?

খুব ছোট্ট হয়ে জন্মেছিলাম আমি। হাসপাতালে তুলোর গদিতে রেখেছিলেন নার্সরা। অনেকদিন পর মার চিঠি পড়ে মনে হয়, আমার জন্যে উনি যেন সেই তুলোর গদির স্বপ্ন দেখছেন আবার। আমার যে অনেক তুলো চাই। সাদা মেঘের মত পেঁজা পেঁজা অসংখ্য তুলো। মা কি পারবেন সেই তুলো এনে দিতে? চারদিকে শুধু কাঁটা, কাঁটা। এই কাঁটালতার হাত থেকে বাঁচতে হলে আমার যে হাজার ধুনকরের হাজার বস্তা তুলো চাই।

পোস্টকার্ডখানায় আর ছুঁচ ফেলার জায়গা নেই। উল্‌টে পাল্‌টে সমস্ত দিকেই মা তাঁর সুনিপুণ কলম চালিয়ে গেছেন।

ওঁরও তো ফেরার সময় হয়ে এল। ফিরে এসে দেখবেন, খাঁচার পাখী হাওয়া।

কাল থেকে বার বার পড়ছি মায়ের কথাগুলো।

সেই চিঠির উত্তর আমি মনে মনে সারাক্ষণই লিখে চলেছি। যদিও মায়ের হাতে কোনদিনই পৌঁছবে না চিঠিটা। আমি লিখেছি, "মা, তোমার অনেক আগেই এসব ভাবনা ভেবে ফেলেছে তোমার আত্মজা। ভাবনাগুলো বড্ড পুরনো। কাউকে বিয়ে করে আমি মুক্তির রাস্তা খুঁজে নিতে চাই না। নিজেকে সম্পূর্ণ না জেনে বুঝে আমি আর একটা জীবনের ঝড় বইব কেন? একটা খাঁচা থেকে বেরিয়ে আর একটা খাঁচায় পা দেবার আগে আমি দেখব আমার মন পাখীটা কোথায়? আমি খাঁচা থেকে বেরুনোর চাবিটা খুঁজছি। আমি আকাশের চাবি চাইছি। যে আকাশ নীল, যেখানে হাজার পাখী ডানা মেলে উড়ে যায়। যে চাবি পাওনি তুমি। সেই চাবির ওপর বড় লোভ তোমার আত্মজার মাগো, তোমায় প্রণাম।"

——